The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 9, No. 18, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

সাবিত্রী উপাখ্যান : বিনির্মাণ দর্শনের আলোয়

জাহিদ হাসান সরকার*

Abstract: The aim of this essay is to analyze the novel *Sabitri Upakhyan* written by Hasan Azizul Haque by following the framework of Jacques Derrida's deconstruction theory. The main focus of this study is to depict the distressed fate of Sabitri, the central character of the novel and identify the way how mythological references are used in this novel to portray her distresses and destiny. The incorporation of myth and the deconstruction theory is the core finding of this study.

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে একজন বিশিষ্ট সৃজনশীল ও মননঋদ্ধ লেখক। বিচিত্র প্রকরণে সাবলীল বিচরণ সত্ত্বেও তিনি মূলত গল্প ও উপন্যাসের শিল্পী। গল্প রচনার প্রচুরতার উত্তুঙ্গ পর্যায়ে এসে পাঠকের দীর্ঘ অপেক্ষা আর বহু ঝুলে থাকা প্রশ্নের যতি টেনে *আগুনপাখি* (২০০৬) হাতে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। এর কয়েক বছরের ব্যবধানে *সাবিত্রী উপাখ্যান* (২০১৩) শিরোনামের আরেকটি উপন্যাস রচনা করেছেন হাসান আজিজুল হক । এছাড়া *তিনটি উপন্যাসিকা* শিরোনামে প্রকাশিত স্বতন্ত্র তিনটি আখ্যান *বৃত্তায়ন*, *শিউলি* ও *বিধবাদের কথা*-কে 'উপন্যাসিকা বলা চলে কিনা' (হাসান আজিজুল হক ২০১০, সংকলন সম্বন্ধে) বলে নিজে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে *সাবিত্রী উপাখ্যান*-কে মূল্যায়নের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে জ্যাক দেরিদার[১] বিনির্মাণ দর্শনের আলোয়।

২.

উপন্যাসের অন্বিষ্ট হচ্ছে ব্যক্তিমানুষ; সমাজ, সময় আর ইতিহাসের বিচিত্র জটিল গ্রন্থি পেরিয়ে নির্মিত হয় এই ব্যক্তিমানুষ। তাই উপন্যাসে মানুষকে খুঁজতে গিয়ে সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। রাষ্ট্রিক আলোড়ন ব্যক্তিমানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে; তাই রাষ্ট্রকেও খুঁজতে হয় উপন্যাসের আখ্যানে। "একদিকে ব্যক্তিমানুষ, আর একদিকে সময় — এই দুই দায়ের ভিতর সংগতি আবিষ্কার করাই ঔপন্যাসিকের শিল্পগত সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন।" (দেবেশ রায়, ১৯৯৪ : ৮৭)। *সাবিত্রী উপাখ্যান* উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষটি সাবিত্রী নামের এক বাঙালি ব্রাহ্মণ-কন্যা। এই নারীকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটির কাহিনি বলয় তৈরি হয়েছে এবং তার

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা সরকারী মহিলা কলেজ, কুমিল্লা।

পরিণতিতেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নিশ্চয়ই এ উপন্যাসে 'সাবিত্রী' রচয়িতার জীবনদর্শনের সংজ্ঞাপক হিসেবে শব্দে-শব্দে রূপময় হয়ে উঠেছে।

পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া আবার সাবিত্রীকে রূপময় করা যাবে না; ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যের কারণেই বাঙালি সমাজে পুরুষ ছাড়া নারীর অস্তিত্ব কল্পনা করা হয় না। এখনো বাঙালি নারীর জীবনে পুরুষের প্রভাব নিয়তির মতোই গভীর। ভারতীয় শাস্ত্রে নারী পুরুষের সর্বময় কর্তৃত্বের আওতায় এমন এক জৈবযন্ত্র — যে একাধারে পুরুষের ভোগের সামগ্রী, সন্তান, বিশেষত পুত্র সন্তানের উৎপাদক; আর তার ভূমিকা নিঃস্বার্থ সেবাময়ীর। এ নারী পুরুষের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্যে আত্মপরিচয়-পরিত্যাগী। পাতিব্রত্যে, সতীত্বে আর মাতৃত্বে — এ নারীর নারীত্ব প্রস্ফুটিত। ভারতীয় 'নারীর সুপরিচিত মোহময় এক বন্ধনের নাম সংসার — স্বামী-সন্তানের দেখাশুনা'। (সিরাজ সালেকীন, ২০১৩ : ৩৩)। ভারতীয় শাস্ত্র নির্দেশিত আদর্শ নারীর ফলিত রূপ হলো সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, শকুন্তলা প্রমুখ পৌরাণিক নারী — যারা সেবায়, প্রেমে, মাতৃত্বে, ত্যাগে পুরুষের মহিমা আর আধিপত্যকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছে। এসব শাস্ত্র-কথিত নারীর প্রত্ন-উপাদানে নির্মিত হয়েছে বাঙালি নারীর মনোজগৎ। আর পুরুষের কায়মনোবাক্যে কামনাই তো নারীর শরীর ও মনের ওপর একচ্ছত্র দখল। কামনার আগুনে এই দখল কখনো কখনো জবরদখলে রূপ নিয়েছে। সময়-স্বভাবে কখনো কখনো পুরুষ মানবিক হয়েছে, আবার হয়েছে পশুর অধম পাশবিকও। ঔপন্যাসিক *সাবিত্রী উপাখ্যান*-এর অভীষ্টে পৌঁছাতে এ সব কিছুকেই নেড়েচেড়ে দেখেছেন।

৩.

হাসান আজিজুল হক *সাবিত্রী উপাখ্যান* উপন্যাসের রচনাকালের পটভূমির কথা বলতে গিয়ে উপন্যাসের এক অংশে বলেছেন : "এখনকার পৃথিবীতে নৃশংসতাই মূল সংবাদ। তার মাত্রা কোন্ তীব্রতায় পৌঁছুলে মনের উপর একটু আঁচড় পড়বে তার হদিশ করা অসম্ভব।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৫৬) বর্তমান সময়ের নৃশংসতার চারিত্র্যকে অভিব্যঞ্জিত করার শৈল্পিক প্রয়াস হিসেবে "স্থির, বদ্ধ, সমস্ত দিক থেকে আটক একশো বছর আগের এই দেশের একটা অঞ্চল থেকে সাবিত্রী অপহরণের ঘটনা" (হাসান আজিজুল হক ২০১৩ : ১৫৬)-কে অবলম্বন করে ঔপন্যাসিক *সাবিত্রী উপাখ্যান*-এ 'পশ্চাৎ-উন্মোচন' কৌশলে সর্বজ্ঞ-কথনের পরিচর্যায় সাবিত্রী নামের শেষ অবধি এক জরতী নারীর পুনঃনির্মাণ করেছেন। সাবিত্রী অপহরণ মামলার এজাহার আর সাক্ষীদের যেসব বিবরণ আদালতে জমা পড়েছিল, তারই 'ছেঁড়াখোঁড়া অংশ', 'টুকরো টুকরো ঘটনা সাজিয়ে' ঔপন্যাসিক সাবিত্রীর ছিঁড়েখুঁড়ে যাওয়া বিপন্ন জীবনকে পুনর্গঠন করেছেন। এই আখ্যানের মধ্যে নানা জায়গায় সন্নিবেশ করা হয়েছে এজাহার আর সাক্ষ্যের টুকরো টুকরো অংশ; ঔপন্যাসিকের ভাষ্যে — 'শুধুমাত্র গল্পটাকে

পরম্পরা ধরে সাজানোর জন্যে। এটা করা হয়েছে এ কারণে যে একমাত্র লেখকই গল্পটা আগাগোড়া জানেন। তিনি যতটা জানেন এই বৃত্তান্তের সঙ্গে যুক্ত আর কারও পক্ষেই ততোটা জানা সম্ভব নয়।' (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৪৪) বাখতিন[২] বহুস্বরবিশিষ্ট সমগ্র-বাস্তবের অংশ হিসেবে উপন্যাসের কাঠামোতে সাহিত্যের নিম-উপকরণ 'কোর্টের বয়ান'কেও স্থান দিয়েছেন। আখ্যানের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে *সাবিত্রী উপাখ্যান* উপন্যাসের কাঠামোয় ঔপন্যাসিকের বয়ানের সমান্তরালে কোর্টের এজাহার গেঁথে দেওয়া গঠনশৈলীর অভিনবত্বকেই চিহ্নিত করে।

সাবিত্রী উপাখ্যান সাবিত্রী নামের এক বিপন্ন নারীর করুণ উপাখ্যান। অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের মধ্যবর্তী জীবনের এক চরম অর্থহীনতাকে ধারণ করে বেঁচে আছে পঁচাশি বছরের এ জরতী। সে বেঁচে আছে কালের সাক্ষী হয়ে, চরম অবক্ষয়িত সমাজের কলঙ্ক-চিহ্ন নিজ দেহে ধারণ করে। উপন্যাসের পট উন্মোচনের গোড়ায় দেখা যায়, নিপাট অন্ধকারে সাবিত্রীর জীবন সমর্পিত, আর এই অন্ধকারই তার কাঙ্ক্ষিত। তার মধ্যে লক্ষ করা যায়, অন্ধকারে মিশে গিয়ে আলোকিত (বিরোধাভাস-সংক্রমিত) সভ্যতাকে প্রাণপণে অস্বীকার করার প্রয়াস। এর কার্য-কারণে নিহিত রয়েছে পুরুষতন্ত্রের নির্মম আসুরিকতা, যা তার জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে সকল আলো, মুছে দিয়েছে তার স্বপ্ন; আর সমগ্র আখ্যান জুড়ে চলেছে অতীতের গহ্বর খনন করে পশুপ্রবৃত্তির কার্য-কারণের সন্ধান।

৪.

সাবিত্রী চরিত্রের দুটি রূপ যুগ্ম-বৈপরীত্যে উপস্থাপিত হয়েছে — 'জরতী' ও 'যুবতী' রূপ। উপন্যাসের পট উন্মোচিত হয়েছে পঁচাশি বছর বয়সী সাবিত্রীর জরতী রূপের বর্ণনায়। সাদা মার্বেলের মতো দুটো চোখ ছাড়া তার আর কিছুই জেগে নেই। চোখ দুটো সারা দিনরাত জেগে থাকলেও আদতে সে কিছুই দেখে না। বায়ু ত্যাগ করতে গিয়ে দুর্গন্ধময় তরল বের হয়ে আসে আর প্রস্রাবে ভিজে থাকে ময়লা শাড়ি। প্রায় অচেতনায় সমর্পিত তার চেতনজগতের বহু গভীরে 'ছায়া'র ছায়ার মতো আবছা ভেসে ওঠে একটি নাম 'নিশিবালা' আর সময়টা কোন পক্ষের — পূর্ণিমার না অমাবস্যার এ জিজ্ঞাসা। অসাধারণ উপমায় উদ্ধৃত হয়েছে জরতীর অবস্থা : "তার মাথাটা এখন পুরোপুরি নিভন্ত উনুন। কিছুই পোড়ে না, রান্না হয় না, সেদ্ধ হয় না সেখানে। সামান্য খড়কুটুও নেই যে মাঘ মাসের হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় একটুখানি তাপ তৈরি করা যায়। বরং শুকনো, ভেজা, পচা লতাপাতায় মাথার শূন্য খোলটাই চাপা পড়ে আছে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১১) সামান্য একটি ঝুড়িতেই তার দেহ এঁটে যায় এবং অযত্নে অবহেলায় 'বাড়ির আরো যেসব জিনিস ফেলে-দিই ফেলে-দিই করেও ফেলা হয় না, পচে যাওয়া, ধসে যাওয়া, পোকায়-কাটা, হাঁড়ির মধ্যে পোড়া, বস্তার মধ্যে ঢোকানো' এমনিতর জিনিসের সঙ্গে এক অন্ধকার, দুর্গন্ধময় ঘরে দূর-সম্পর্কীয় এক নাতনির

দয়ায় আশ্রয় পেয়েছে। অথচ এই দেহটি এক সময় অত্যন্ত কমনীয় ও পুরুষের কাছে ছিল অতি লোভনীয়। পনেরো-ষোলো বছরের সাবিত্রীর যুবতী রূপ আর সেই রূপকে বন্য-দস্যুতায় পুরুষ কর্তৃক ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়ার দৃশ্যও বর্ণিত হয়েছে যুগ্ম-বৈপরীত্যের উল্টো পিঠে।

সাবিত্রী পৃথিবীতে জন্মেছিল 'চাঁদের একটি ফালি'-র মতো রূপ নিয়ে। এক অনিন্দ্যসুন্দর রূপ আর সৌরভ গায়ে মেখে শ্বেত-শুভ্র পবিত্রতায় ভুঁইচাঁপা ফুলের মত আলগোছে যেন ফুটে উঠেছিল সাবিত্রী। সাবিত্রী যেন সকল কলঙ্ক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে এক নির্মল সৌন্দর্যসত্তা : "কেউ নয়, কিছু নয়, দীঘির মাঝখানে একা অনপেক্ষ নির্জন একটি পদ্ম।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৩৪) নিশিবালার বয়ানে সাবিত্রীর রূপের একটি পরিচয় ফুটে উঠেছে : "মাগো মা, মানুষ এত সোন্দর হয় গো দিদি! লক্ষ্মী-সরস্বতী, দুগ্‌গা-পিতিমে এমন সোন্দর হতে পারে না। তাই বলি দিদি, এত রূপ নিয়ে তুমিই বা কি করবে আর এই পোড়া সংসারই বা কি করবে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৮) এই বিমল রূপ ঠিকরে বেরিয়েছে সর্বত্র; বিচিত্র চোখে ধরা পড়েছে সেই রূপের আভা; কেউ মুগ্ধ হয়েছে, আর কেউ হয়েছে মোহাবিষ্ট — লোভের তপ্ত আগুনে পুড়িয়ে ভোগের মত্ততায় হয়েছে বিভোর। সাবিত্রীর সুন্দর তনু হয়েছে পশুর খাদ্য; সৌন্দর্যের প্রতি পাশবিক মুগ্ধতাবশত পশুরা তাকে ভয়ানক মত্ততায় ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে। বলা বাহুল্য, সাবিত্রীর রূপবহ্নিই তাকে পুড়িয়েছে, পুড়েছে রূপমুগ্ধ নরপশুরা, এই রূপবহ্নি হিংসার দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশময়।

৪.১

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর জীবন মানেই তার চারপাশে পুরুষের সুদৃঢ় দেয়াল। ভারতীয় কঠোর অনুশাসনে নারী পুরুষের সম্পদে পরিণত হয়েছে বহুকাল ধরেই। সুতরাং সম্পদ ভোগ করার সঙ্গে এর সুরক্ষার প্রশ্ন জড়িত। সম্পদের সঙ্গে আবার লোভ জড়িত; নিজেরটা তো আছেই, সুযোগ পেলে বাড়তি হিসেবে অন্যেরটার দিকে হাত বাড়ানো যেন মানুষের সহজাত প্রবণতা। তাই অলংকারের নামে পায়ে মল পরিয়ে নারীর গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি নারীর মনে সতীত্বের ধারণা দৃঢ়মূল করার প্রয়োজন ছিল। সতীত্ব-স্খলনের নামে শাস্ত্র জারি করেছিল ভয়ানক সব শাস্তির বিধান। শাস্তিগুলো নারীর জন্যই প্রযোজ্য ছিল, তাতে নারীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার যোগ যা-ই থাকুক না কেন, সমাজে তাকে পরিত্যক্ত হতেই হতো। রাবণের হাতে সীতাকে অপহৃত হতে হয়েছিল স্বামীর সেবার্থে বনবাসে গিয়ে; তা-ও নিজ দোষে নয়, দেবর লক্ষ্মণের নারী-অবমাননার প্রতিক্রিয়ায়। আর রাবণও সীতাকে অপহরণ করেছে বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে। রাবণের মনে যা-ই থাকুক না কেন সীতার সতীত্বের কোনো ক্ষতি সে করেনি। কিন্তু ধর্মীয় প্রথার কারণে মূল্য সীতাকেই দিতে হলো — দু-বার; আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে; তাতেও যখন অবিশ্বাসী পুরুষ-মনকে আশ্বস্ত করা গেল না, তখন মাটির ফাটলে নিজেকে সমাহিত করে। সীতার এই আত্মত্যাগ

মহিমারূপে সমাজে বন্দিত হলো। আর 'মিথিক্যাল রিমাইন্ডার' হিসেবে সীতাকে স্বীয় চৈতন্যে ধারণ করে নারী নিজেকে নিজের সতীত্বের অতন্দ্র পাহারায় নিয়োগ করেছে। কিন্তু পুরুষের পায়ে তো আর সমাজ বেড়ি পরায়নি, লাগাম পরায়নি তার প্রমত্ত লোভের মুখে; ঘরে-বাইরের সকল নারীর প্রতিই তার লেলিহান লোভ সাপের মত হিলহিল করে ঘুরে বেরিয়েছে। *সাবিত্রী উপাখ্যান*-এ ঘটেছে এই বাস্তবতারই নিখুঁত প্রতিফলন।

তিন বছর বয়সে সাবিত্রী মাকে হারিয়েছে, কিন্তু মা তার চেতনায় এতটাই অনুপস্থিত যে বারবার তার কথায় ফুটে উঠেছে জন্ম মাত্রই মা-হারানোর গভীর অভিব্যঞ্জনা : "খুব অনেয্য এক কাজ করেছিল মা। সে আর একটু আগে মরলে আমি জন্মাতাম না। ঐ আবাগী তা না করে আমাকে পিথিমিতে জন্মো দিয়েই মরে গেল।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৩০) আচারনিষ্ঠ, রক্ষণশীল পিতা সাবিত্রীর জীবন থেকে এতটাই আলগা যে, কখনোই তার মনে হয়নি তার পিতা ছিল। তবে পিতা যে ছিল, তার ভয়াবহতম প্রকাশ ঘটেছিল গৌরীদানের অমানবিক প্রথার নামে মাত্র সাত বছর বয়সে এক বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ-গৃহে সাবিত্রীকে বিয়ে দিয়ে। উল্লেখ্য হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* উপন্যাসে কন্যার বিয়ে দানে পিতার স্বেচ্ছাচারিতা থাকলেও ভাত-কাপড়ের সুবিধা নিশ্চিত করে কন্যার ভবিষ্যৎ সুক্ষার দায় অনুভব করেছে পিতা। কিন্তু সাবিত্রীর পিতার বিশ্বাস : "ভাত-কাপড় আবার কে কাকে দেয়? ও-তো ভগবান দেয়। দিলে দেবে, না দিলে মাথা খুঁড়ে মরলেও জুটবে না।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৪) প্রথার অজুহাতে সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছিল এই গোঁয়ার পিতা; বপন করে দিয়েছিল কন্যার জীবনের করুণ ইতিহাসের ভয়াবহ বীজ। সাবিত্রীর স্বামীর নাম দুকড়ি হলেও জীবনের বাজারে যার মূল্য 'কানাকড়ি'-ও ছিল না। দুর্বিষহ ক্ষুধার প্রহার থেকে আত্মরক্ষার জন্য যাকে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ আর সুরক্ষার বিষয়টি তার কাছে উপেক্ষিত হবে তা-ই স্বাভাবিক। তাই মাতৃ-পিতৃ-হারা এই ব্রাহ্মণ-কন্যা প্রায় বিনা যত্নেই বনের উদ্ভিদের মতো বেড়ে ওঠে; প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই সাবিত্রী হয়ে ওঠে একজন সন্তান উৎপাদন-ক্ষম সৌন্দর্যময়ী নারী। কিন্তু ভয়ানক অভাব দুকড়িকে অন্ধ করে রেখেছিল; সাবিত্রীর ভরা-সৌন্দর্যের বার্তা তার বুভুক্ষু চেতনায় ধরা পড়েনি : "ওর চোখ, কান, নাক কিছুই নেই। কোনো গন্ধই পায় না সে? সন্ধেয় কুমুদ ফোটে, সুয্যির আলো দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফোটে পদ্ম। এসব রাতদিন দেখেছে দুকড়ি। অথচ এমনি ভয়ংকর খিদে আর নিজের ভেতরের কুঠুরির দরজা এমনি শক্ত বন্ধ যে চোখ, নাক, কান থেকেই পেটের উনুনের কি লাভ? সংকুচিত, ছোট, কঠিন, শুকনো পনেরোটি বছর ধরে অক্লান্ত নিষ্ঠুর সময়ের গড়া দুর্লভ কুঁড়িটি নতুন হাওয়ায় প্রাণ পেয়ে যে পাপড়ি মেলতে শুরু করেছে সে খবরটাও রাখে না হারামজাদা!" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ২২) দুকড়ি অন্ধ বলে লোভী পুরুষদের চোখ তো বন্ধ ছিল না। সাবিত্রীর ভোগযোগ্য অনিন্দ্যসুন্দর দেহটির পেছনে পেছনে সাপের মতো ঘুরে ফিরেছে পুরুষের পাশবিক লোভ; আর এক অজানা আতঙ্কে সাবিত্রী

ছিল জড়োসড়ো : "ভীষণ আতঙ্কে নিজের দিকে একবার তাকাল। ঘাসের মধ্যে সাপ ঘুমিয়ে আছে কি ? এখন তো ভীষণ শীতকাল।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ২৪) ভ্রাতৃগৃহে প্রায় অরক্ষিত সাবিত্রীকে অপহরণ করে ইচ্ছেমতো ধর্ষণ করার সুযোগ নারীলোভী পুরুষদের জন্য অনেকটা অবারিত ছিল। সুযোগের মোক্ষম ব্যবহার করেছে কামনাতুর পুরুষদের দল। 'বর আসার পেথম রাত'-এর জন্য সনাতন মূল্যবোধ-লালিত কুমারীকন্যা তার শ্বেত-শুভ্র পবিত্রতা নিয়ে বিয়ের সাজে স্বামীর কাছে যখন আত্মনিবেদনের প্রতীক্ষায়, সেই রাতেই পুরুষের লোভ তার কামনা পূরণের জন্য জেগে ওঠে : "ঘাস-পাতা ঢাকা সাপটা কি আগুনের গরম টের পেয়ে সামান্য নড়ে ওঠল?" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ২৫) সে রাতেই সাবিত্রী কয়েকজন 'ষণ্ডা শুয়োরের' হাতে অপহৃত হয়। 'মেয়েমানুষের দেহ'-কে হিংস্র হায়েনার মতো ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে বলে নিয়ে গেছে অজয় নদের পাড়ে, যে কিনা পুরুষ বলে নিজের বালুর চরে ধর্ষণের উপযোগী নির্জন পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। অজয়ের পাড়ে ধর্ষকামী পুরুষের যে চেহারা ফুটে উঠেছে, তাতে নারীর শরীরী ভোগের তাড়নায় পুরুষমাত্রই 'বিকট একটা ইচ্ছের পিণ্ড', 'তীব্র অদম্য হাজার ইচ্ছের ভেতর থেকে বিষ-আগুনের একটা শিসের মতো' এই তাড়না বের হয়ে আসে। প্রসঙ্গান্তরে আসবে এ প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ।

৪.২

সাবিত্রী ভারতীয় মূল্যবোধ লালিত নারী; তার শেকড় প্রোথিত রয়েছে হাজার হাজার বছরে গড়ে ওঠা ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে। মায়ের স্নেহময় নিবিড় তত্ত্বাবধানেই সাধারণত কন্যার মানস-গঠন হয়ে থাকে। কিন্তু সাবিত্রীর "মা নেই, পেত্যেকদিন মা নেই। চিরকাল মা নেই।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৫) মাতৃহীনতা সাবিত্রীকে গভীর নৈঃসঙ্গ্যে, শূন্যতায় আর অসহায়ত্বের নিগড়ে নিক্ষিপ্ত করেছিল। মায়ের শূন্যতা পরম মমতায় পূরণ করে দিয়েছে নিশিবালা, যাকে সাবিত্রী হাড়িদিদি বলে ডাকে। জাতপাতের কঠিন অনুশাসন ভেঙে 'বার বছর বয়স থেকেই চার বছরের বামুনের মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। ছাড়বে না তাকে কিছুতেই। টানা ধরে রইল তাকে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৩) সাবিত্রীর "মনে পড়ে হাড়িদিদির গায়ের কোনো আলাদা গন্ধ সে পায়নি যদিও হাড়িদিদি তাকে ছুঁতে পারত না। তবু কতোবার যে ঘরের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে তাকে হাড়িদিদি। শুধু একটা তাজা মানুষের গন্ধ। আর কোনো গন্ধ নেই তার।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৬৮) সাবিত্রীর চেতনায় সংসার-ধর্মের উপলব্ধি তৈরি হয়েছে হাড়িদিদির তত্ত্বাবধানে। সাবিত্রীর 'মেয়ে' থেকে 'মেয়েমানুষে' রূপান্তরের সংবাদ জ্ঞাপন ও রূপান্তরিত মেয়েমানুষ হিসেবে কর্তব্য সম্পর্কে সাবিত্রীকে সজাগ করার দায়িত্বটি পালন করেছে হাড়িদিদি: "সোয়ামির কাছে যেতে হয় নাকি দিদি, ধম্মে বলে। নইলে সন্তান হবে কি করে?" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৭) সংসার আর সন্তানের জন্য সাবিত্রী মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয় হাড়িদিদির তত্ত্বাবধানে। সে স্বামীর চাকরি সন্ধানের জন্য নিজের 'অনন্ত' বন্ধক রেখে

টাকা জোগায়; মাতৃত্ব অর্জনের স্বপ্ন বুকে ধারণ করে স্বামীর সঙ্গে মিলনের জন্য বিয়ের সাজে অপেক্ষা করে; বিয়ের সাজের পূর্ণতার জন্য বন্ধক রাখা অনন্ত ফেরত পেতে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। সংসারের প্রতি প্রবল অনুরাগেই ধর্ষিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ধর্ষকদের প্রতি সাবিত্রীর আকুতি ঝরে পড়ে : "মা, মা গো, আমার অমন সব্বোনাশ করো না, তোমাদের পায়ে পড়ি, এই সব্বোনাশ করো না, সব নিয়ে নাও, চুড়ি-বালা-হার। আমি এয়োতি, এখনো স্বামী কাকে বলে আমি জানি না, আমার ইহকাল পরকাল সব যাবে। নরকে ঠাঁই হবে না, সংসারে ঠাঁই হবে না, পিথিমিতে ঠাঁই হবে না।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৩৫) কিন্তু শিকার হাতে পেয়ে কবে কোন মাংসাশী প্রাণী শিকারের আর্তনাদে কান দিয়েছে? এক ভয়ংকর পাশবিকতায় ধর্ষিত হয় সাবিত্রী, তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায় ঔপন্যাসিকের কথনে : "সে (দুর্গাপদ) হাত বাড়িয়ে সাবিত্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বালির ওপর শুয়ে পড়ল। বটা, হাত দুটো চেপে ধর, সবুর তুই পা দুটো চেপে ধর।... ভীষণ বিরক্ত দুর্গাদাস বটার দিকে চেয়ে বলল, মুখটা চেপে ধরতে পারছিস না! দুই হাতের ওপর বোস, মুখটা চেপে ধর।... দুর্গাপদ সযত্নে শুয়ে পড়ল সাবিত্রীর ওপর। ইস্পাতের একটা বল্লম স্বচ্ছ আচ্ছাদনটুকু ছিঁড়ে মাখনের শেষ মাখায় গিয়ে পৌছুল। সাবিত্রী আর একবার মাত্র চিৎকার করে উঠল। পৃথিবীতে বিশুদ্ধ, সংক্ষিপ্ত মৃত্যু-চিৎকার এই একটাই।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৩৫) নির্জন, নিভৃত পল্লীর আরো নিভৃততম গৃহে প্রকৃতির আপন নিয়মে বেড়ে উঠা সাবিত্রীর জীবনের ক্রুর জটিলতা সম্পর্কে ধারণা ছিল না; তার জানা ছিল না কী ভয়ানক লোলুপতা নিয়ে মেয়েমানুষের দেহকে অনুসরণ করে পশুপ্রবৃত্তির পুরুষ। সহজ বিশ্বাসে ডোম-বউ সরোজিনীর প্ররোচনায় বন্ধক-রাখা অনন্ত আনতে সে আমবাগানের পথে পা বাড়ায়; আর ডেকে আনে নিজের জীবনের করুণ পরিণতি।

সাবিত্রীর অপহৃত হওয়ার মধ্য দিয়েই আখ্যানের প্রকৃত শুরু। ঔপন্যাসিকের ভাষায় : "শুরুটা তো বলা হয়েই গিয়েছে, এখন শুধু ফিতে টানা। দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণের টানা পরিশ্রম সহজে ক্ষান্ত হবার নয়।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ২৮) উপন্যাসের আখ্যান এগিয়েছে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে। একটি শাখা সাবিত্রীর ওপর ধর্ষণের পাশবিকতা ও সাবিত্রীর মনস্তত্ত্বে এর রক্তাক্ত প্রতিক্রিয়ার ইতিবৃত্ত; আর দ্বিতীয় শাখাটি গড়িয়েছে বৃহৎ দেশকালের পটে ব্রাহ্মণ-কন্যার সতীত্ব-হরণের কারণে সহিংস আলোড়নের প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের পরিণতিতে এই দুই শাখা এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে উপন্যাসের কাঙ্ক্ষিত জীবনসত্যকে বিম্বিত করেছে।

৪.৩

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোর্টের নীরস, রক্ত-মাংসহীন বয়ান সরস ও প্রাণময় আখ্যানে রূপান্বিত হয়েছে প্রকৃতি ও পুরাণের বহুমাত্রিক পরিচর্যার আশ্রয়ে। আখ্যানে প্রকৃতি কোথাও পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে, কোথাও কাহিনির সঙ্গে বিষয়বস্তুর বন্ধনে বাঁধা, কোথাও প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বর্ণিল। প্রকৃতি ও পুরাণের অবিরত উল্লেখ এই আখ্যানের

গ্রন্থি বুননে রেখেছে দূরবাহী তাৎপর্য। বলাবাহুল্য, আলোচ্যমান আখ্যানে প্রকৃতি আর পুরাণ চিরাচরিত রূপে রূপময় হয়নি, প্রকৃতি আর পুরাণ এসেছে ভেঙেচুরে বিনির্মিত রূপে।

সাবিত্রীর অপহরণ মুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিত রচনায় ও সাবিত্রীর জীবনের পরিণতির ব্যঞ্জনায় প্রকৃতি অলঙ্ঘনীয় নিয়তির ভূমিকায় অবতীর্ণ : "দুকড়ি আজ রাতেই আসছে। চাঁদটা যে কি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে! অনন্তখানা চাই-ই চাই। এই রকম চাঁদ আর সে কোনোদিন দেখতে চায় না। সাবিত্রী এক লহমায় পৌঁছে গেল বাগানের অন্ধকার সীমানায়।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ২৭) এই সীমানাটি পার হওয়ার পরই তো সাবিত্রীর জীবনে কেবলি গহন অন্ধকার। 'একটা তরতাজা, ছটফটে, জ্যান্ত খাবার'-কে হিংস্র পশুর মতো ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে বলেই দুর্গাপদ, বটকৃষ্ণ, সবুররা সাবিত্রীকে অপহরণ করে। অপহরণের এই হিংস্রতার পটভূমি হিসেবে প্রকৃতির গায়েও মিশে আছে ভয়ানক হিংস্রতা : অজয়ের পাড়ে 'অজানা নিষ্ঠুর শত্রুর মতো শাদা বালুর চর', আর 'কাঁটা, জঙ্গল, ভাঁট আর শেওড়া আকন্দের ঘন বন', অজয়ের 'জলের ঠাণ্ডাটা কেটে নিচ্ছিল হাঁটু পর্যন্ত দুই পা', 'মাথার ওপর তারাহীন এক হিংস্র আকাশের চাঁদ'। (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৩২)

আসুরিক সময়ে জীবনের চিরায়ত শুভ বোধগুলি ভেঙে পড়ে, মানবিক মূল্যবোধে নেমে আসে ভয়ানক ধস। ধসে যাওয়া সময়কে ধরতে যুগ্ম-বাস্তবতার প্রথানুগত কল্যাণ-কাঠামোর সারণির উগ্র বিচ্যুতি ঘটিয়ে বিনির্মিত অকল্যাণবোধ প্রাধান্য লাভ করে। তাই এই উপাখ্যানের উপমা, চিত্রকল্পে প্রকৃতি বীভৎস রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। হিংস্রতার আখ্যান গড়ে উঠেছে হিংস্র শব্দপ্রতিমার আশ্রয়ে। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত : 'রং-জ্বলা ঘাসের মতো দাঁড়ি', 'ছুঁচোল মুখের শেয়াল', 'দাঁড়কাক', 'কাপড় জড়ানো বাঁশের লগি', 'শুকনো ইঁদুর', 'শুকনো বাঁশ', 'খোলা চুলে কালো কালো হিংসুটে সাপ', 'মহাসুযোগসন্ধানী নেড়ি কুকুর মাটিতে থাবা গেড়ে বসে নিশ্চিন্ত মনে একটা মরা গরুর মাংস খাচ্ছে', ' মুখ..টিকটিকির মতো ফ্যাকাশে', 'মরা টিকটিকির মতো' ইত্যাদি।

সাবিত্রী উপাখ্যান-এর পুরো আখ্যান বিভক্ত হয়ে আছে আলো/অন্ধকার-এর যুগল কায়ায়। কারণ যার সম্পর্কে এ উপাখ্যান সেই সাবিত্রী- 'সময়কে দুভাগ করে নিয়েছে। আলোতে আর অন্ধকারে।' (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১০) সাবিত্রীর জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধির অনুষঙ্গেই আলো-অন্ধকারের ছায়াবাজি হয়েছে এই আখ্যানে: "সাবিত্রীর চিরকাল মনে হয়েছে তারা ভরা আকাশের একটুও দয়া নেই, এবারে জেনে গিয়েছে শাদা জোছনা আরও নিষ্ঠুর, আরও নির্লজ্জ। ন্যাংটো উদম সাবিত্রীর দিকে সে আগাগোড়া চেয়েছিল।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১১৮)

আখ্যানের অবয়ব জুড়ে পূর্ণিমার চাঁদ ও জোছনা সম্পর্কিত বিনির্মিত বোধস্পর্শী টুকরো টুকরো অসংখ্য উপমা ও চিত্রকল্প ছড়িয়ে আছে। যেমন–

(ক) "কি মারাত্মক চাঁদের আলো, দিনের রোদও হার মেনে যায়, তবু এ শীতের চাঁদ।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৩২)

(খ) "এই নোংরা জিনিসটা তখন কেবল আকাশে উঠেছে, রংটা দেখাচ্ছে মানুষের বিষ্ঠার মতো খয়েরি লাল।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৬৫)

(গ) 'চাঁদের আলো ঠাণ্ডা আর মরা', 'লালচে চাঁদ' (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৬৯)

(ঘ) 'জ্যোৎস্না ফেঁসে ছিঁড়ে ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে এল।' (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৭১)

(ঙ) "ভোজবাজির মতোই ছিঁড়ে ফেটে একেবারে নষ্ট দুধের মতো জ্যোৎস্না উধাও হয়ে গেল।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৭১)

আখ্যানে 'জোছনা'র বিপরীতে অন্ধকার রূপময় হয়ে উঠেছে 'কোমল স্নিগ্ধ অন্ধকার', 'ঘন ক্বাথের মতো অন্ধকার', 'শাদা অন্ধকার' (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১১৮) ইত্যাকার উপমাত্মক চিত্রকল্পের বিনির্মিত আধারে।

চাঁদ আর জোছনা চিরায়ত মানবিক বোধে স্নিগ্ধ, লাবণ্যময়, শান্তিময় ও আনন্দদায়ী; সৌন্দর্যপিপাসু মানুষের এক পরম কাঙ্ক্ষিত উপকরণ। শরীরে জোছনা মেখে মানুষ লাভ করে গভীর প্রশান্তি; জোছনা মানুষের প্রেমময় মনকে করে উতলা, শাশ্বত প্রেমের বাণী জোছনার উপস্থিতিতে শত সুরে ঝংকার তোলে। আর অমাবস্যার অন্ধকার চিরকালই মানুষের জন্য ভীতিকর। অন্ধকার তার আপন আধারে অনায়াসে লুকিয়ে রাখতে পারে হিংস্র অশুভ শক্তিকে, ভয়ানক সব নখর মেলে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে সাপ, নেকড়ে, হায়েনা––এসব হিংস্র জন্তুরা; আর জ্বীন, প্রেত, ভুত-এর মতো আধিভৌতিক প্রাণীরাও। তাই রাতের সময় চিরকালই পূর্ণিমা/অমাবস্যার যুগল-ধারণার আশ্রয়ে বিভক্ত। আলোর পূজারি মানুষেরা পূর্ণিমার মধ্যেই স্বস্তি ও কল্যাণ অনুভব করেছে; আর অন্ধকারকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে অশুভশক্তির ধারক হিসেবে। কিন্তু সাবিত্রীর ভেঙেচুরে যাওয়া চেতনায় আলো/আঁধারের যুগ্ম-বৈপরীত্যের চিরায়ত খোলসটি ভেঙে গিয়েছে; পাশবশক্তির হিংস্রতায় ক্ষত-বিক্ষত তার মনোচৈতন্যে উল্টে গিয়েছে চিরায়ত বিশ্বাস, বিনির্মিত হয়েছে প্রথানুগত যুগ্ম-বৈপরীত্য। অন্ধকার উঠে এসেছে আলোর ওপরে, অন্ধকার শ্রেয় হয়েছে আলোর চেয়ে, 'পূর্ণিমার আলো চিরতরে নিভে যাওয়ার' আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠেছে মনোচৈতন্যে। কারণ আলোর উপস্থিতিই হিংস্র পশুদের কাছে তার শরীরটাকে তুলে ধরেছে, পূর্ণিমার আলোতেই ধর্ষণে ধর্ষণে ক্ষতাক্ত হয়ে জীবন ও সংসার থেকে সে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে। আলোই তার জীবনে বয়ে এনেছে ভয়ানক সর্বনাশ। নিজেকে পশুদের দৃষ্টি থেকে অনায়াসে আড়াল করা যায় বলে অন্ধকার হয়ে ওঠে তার কাছে 'কোমল স্নিগ্ধ'।

৪.৪

সাবিত্রী উপাখ্যান যেন এক জন্তুময় জঙ্গল; মাংসের লোভে শিকারের উপর মাংসভুক জন্তুদের হামলে পড়ার মিছিলে পরিকীর্ণ এ আখ্যান। সাবিত্রীর মাংসময় দেহটি ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়ার জন্যই গুটিকয়েক নরপশু সাবিত্রীকে অপহরণ করে। পশুর হিংস্রতায় সাবিত্রীকে ধর্ষণে ধর্ষণে ক্ষত-বিক্ষত করার আগাম ঘোষণা প্রতিবিম্বিত হয় দুর্গাপদের উক্তিতে — "শুধু একবার মাংস খাবার জন্য ওকে আনা হয়নি।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৩৩) পশুর নিষ্ঠুর হিংস্রতার উপমায় ধরা পড়েছে নিষ্ঠুর ধর্ষণের চিত্র : "দলের সবচেয়ে বড় সিংহটা দাঁত আর থাবা বসিয়ে যখন মাংসের চাঙরটা নিয়ে যায়, তারপর ছিন্নভিন্ন শিকারের বাকিটা কে কার আগে বা পরে কতটা নিতে পারল, তার হিসাব না করলেও চলে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৩৬) উপন্যাসে জান্তব ধর্ষণের টানা বিভীষিকার কাহিনি এগিয়ে গেছে জন্তুর প্রতিমায়[৩] : "জোতদার জমিদারের জমির খুঁটোয় বাঁধা চাষীপ্রজার মতো, ঠুলি-বাঁধা ঘানি ঘোরানো গরুটার মতো এই গল্প এখন।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ২০২) উল্লেখ্য, প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য উপন্যাসে জন্তুপ্রতিমা ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "মানুষ পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে : এ হল পশু-পাখি-সরীসৃপের প্রতিমায় উপন্যাস পরিকীর্ণ দেওয়ার সহজ, সাধারণ মানে।...সমষ্টিগতভাবে, এই প্রতিমাশ্রেণি হয়ে উঠেছে সমাজব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যার প্রকল্প : একটা সমগ্র সমাজের মানবিক থেকে জান্তব পর্যায়ে অবনয়নের চিত্ররূপ।" (প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ২০১৪ : পৃ. ৪৬-৪৭)

ভয়ানক নৃশংসতা আর পাশবিকতায় একের পর এক পুরুষের হাতে ধর্ষিত হতে হতে সাবিত্রীর বিক্ষত চেতনায় পুরুষের পরিচয় নির্দিষ্ট হয় পশু প্রতিমায়। প্রতিটি পুরুষের উপস্থিতিতে প্রথমেই পুরুষটিকে সাবিত্রী শনাক্ত করে কোনো পশুর আদলে।

সাবিত্রীর জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয়ের শুরুটা হয়েছে দুর্গাপদকে দিয়ে, তারই জান্তব আক্রমণে সাবিত্রীর জীবন তছনছ হয়ে গিয়েছে। সাবিত্রীর চেতনায় দুর্গাপদ এক নিকৃষ্টতম পশু : "তার (দুর্গপদ) মুখটা একবার দেখতে চেয়েছিল সাবিত্রী, ঠিক কোন জানোয়ারের মতো দেখায় পুরুষ মানুষের মুখ! পৃথিবীর কোনো জন্তুই নেই এ রকম।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৫৯-৬০)

অন্যত্র সাবিত্রী ধর্ষণের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে হতে ভাবে : "এই হারামজাদা সুদখোর শুয়োরের বাচ্চা দুর্গাপদর আর শেষ হচ্ছে না। কেবলই খাবলাচ্ছে। দাঁতে মাংস লেগে আছে, সবটা গিলতেও পারছে না, তবু সে কেবলই খাবলাচ্ছে, নখ দিয়ে ফালা ফালা করে দিচ্ছে সাবিত্রীর বুক। একবার মুখ দিয়ে নিয়ে গেল নাভির তলায়, মাংস বোধহয় তুলেই নিল খানিকটা।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৪৫)

দুর্গপদরা পশুর মতো আক্রমণ করে; আবার পশুর মতোই আত্মরক্ষার জন্য হয় পলায়নপর। পাশবিকতার শাস্তির ভয়ে আত্মভাবনায় দুর্গাপদ নিজেকে চিহ্নিত করে পশুর চেয়েও হতভাগ্য হিসেবে : "দুর্গাপদ ভাবছে, শালা, পাঠা যেমন পাঁঠি খোঁজে, পেলেই কাজ শেষ করে নেয়, বোকা পাঁঠার কি সুবিধে — কাজ শেষ তো শেষ, কোনো দায়ধাক্কা নেই, আবার পাঁঠি খোঁজো, নাহলে গাছতলায় শুয়ে শুয়ে জাবর কাটো। মানুষের শালা এ-সুবিধে নেই। ... আমরা পাঁঠাগুলো কি একবারও ভেবেছিলাম, এ তো মানুষের পাঁঠি, কাজ শেষ করে দিলেই হচ্ছে না, তার পরে কি হবে? আমরা শালা ঠিকঠাক পাঁঠা হতে হতে মানুষ হয়ে গিয়ে কি বিপদেই-না পড়লাম। পাঁঠা ভালো, মানুষ-পাঁঠা মহা জবরজং।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৫০)

সাবিত্রীর চেতনায় সবুর আর তিনু মুনশি যথাক্রমে বিড়াল ও শেয়াল প্রতিমায় চিহ্নিত : "কে এসে শুয়েছে পাশে, কোথায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে সাবিত্রী — বিকেলবেলার শেয়ালটা কি আর একবার উঁকি দিয়ে গেল, কাছে এসে শুঁকে দেখছে সারা গা, মুখের ওপর কতকালের পচা নিশ্বাস ফেলছে? টুপ করে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠল, সরু মুখের কড়া কড়া লোম দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগল চোখে-মুখে। একটা বেড়াল দেখে একবার দাঁত খিচোল, ফ্যাঁস করে উঠে বেড়ালটার পিঠ বাঁকা টান টান ধনুক হয়ে উঠল। লাফ দিয়ে নেমে গেল শেয়ালটা। সে চলে গেলে বেড়ালটা বিছানায় উঠে সাবিত্রীর গা ঘেঁষে শুয়ে রইল।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৮২) আর আত্মভাবনায় সবুর নিজেকে চিনেছে তাড়া-খাওয়া লেজ-গোটানো নেড়ে কুকুরের প্রতিমায় : "মার-খাওয়া নেড়ি কুকুরের দশা সবুরের। যেন এইমাত্র পাছায় দু-ঘা দিয়েছে গেরস্ত, কেঁউ কেঁউ করে সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আসতেই পড়েছে পাড়ার নেড়ি কুকুরগুলোর পাল্লায়, তারা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে একটা পচা ডোবায়, নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। তারপর থেকে সে ল্যাজ নামিয়ে বেশারতুল্লার দেওয়া গরুর গাড়িতে মাঠে মাঠে কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছে। শরীরটা পচা পানিতে ভিজে ন্যাতা, ল্যাজটা দু-পায়ের মাঝখানে চেপে ধরে রাখা, পাশে একটা ঠাণ্ডা হিম অকহতব্য সুন্দর শরীরের বোমা। যে কোনো সময়ে তার ভেতরের ভয়ানক আগুনে ফেটে পড়বে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১০৩)

ধর্ষণের মিছিলে সাবিত্রী সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা পেয়েছিল হুদার কাছ থেকে; তাই সাবিত্রীর চেতনায় হুদা শনাক্তি-রহিত এক ভয়ংকর জন্তু : "সাবিত্রী একদৃষ্টে হুদার দিকে চেয়ে হিসেব করতে চেষ্টা করল : এ কেমন করে খায়, থাবা বসিয়ে ছিঁড়ে নেয়, না, হাড়মাংস চিবিয়ে খায়, চুষে খেতে পছন্দ করে, নাকি তার তর সয় না, প্রাণপণে গিলতে থাকে? এ আবার কতদিন কতরাতের জন্যে এলো।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৮১) সাবিত্রীর চেতনায় হুদার ভয়ানক জন্তু প্রতিমার পরিচয় অন্যত্র,– "কোনো কোনো জন্তু কামে বা ক্রোধে উন্মত্ত হলে ভয়ানক গন্ধ ছাড়তে পারে। সাবিত্রী টের পায় একটা উৎকট দুর্গন্ধে ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেল।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৯১)

মওলাবখ্শ বুড়ো বাঘ বা সিংহ প্রতিমা রূপে সাবিত্রীর চেতনজগতে আবির্ভূত হয় : "যে চারটে বাঁকা লম্বা দাঁত দিয়ে বাঘ সিংহ শিকার কামড়ে ধরে, মওলাবখ্শের তার একটিও নেই। যতো জোরেই কামড়ে ধরুক ফস্কে যাবেই অথচ ধরে ফেলেছে ভেবে লালা গড়াচ্ছে মুখ থেকে।.. যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ছেড়ে সে দেয়নি সাবিত্রীকে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ২০০-২০১)

সাবিত্রীর চেতনায় দুকড়ির "খেঁকুটে চেহারাটা ঠিক যেন লাথি-খাওয়া কুকুর।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৪৯)

বিভিন্ন জন্তুর দ্বারা ধর্ষিত হতে হতে সাবিত্রী মনের ঘৃণা একসঙ্গে জমা করে উগড়ে দিয়েছে পুরুষের দিকে : "পিথিমির মদ্দা কোনো শুয়র যেন তার কাছে না আসে!" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১২৭) অথবা নরপশুদের জন্ম নিয়ে প্রকাশ করেছে সংশয় : "এই শুয়োরের বাচ্চারা কোথা থেকে এসেছে? এরা কি মেয়েমানুষের পেট থেকে জন্মেছে, নাকি কুকুর যেখানে পেচ্ছাব করেছে, সেখানকার মাটি থেকে জন্ম নিয়েছে?" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৫৬)

এভাবে সাবিত্রীর ভাবনায় যে জন্তুজগৎ গড়ে উঠেছে তা শুধু শব্দার্থের সীমায় কেন্দ্রীভূত নয়, ভাঙচুরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া চেতনায় জন্তুর প্রতিমাগুলো বিনির্মিত জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয়।

৪.৫

ভারতীয় নারী প্রবল বৈরী পরিবেশে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে দেখে সৃজনের স্বপ্ন; এই নারীর মর্মমূলে নিহিত থাকে প্রবল জীবনতৃষ্ণা, ইতিবাচক জীবনবোধের টানেই তার চেতনা জুড়ে বিরাজমান থাকে স্বামী-সন্তান পরিপূর্ণ একটি সংসারের আলপনা। ভারতীয় সনাতন নারীর জীবনবোধের অসাধারণ স্ফূরণ লক্ষ করা যায় সাবিত্রীর মধ্যে।

ধর্ষিত হয়ে সাবিত্রী সমাজ, সংসার, ধর্ম সব হারিয়ে এক অর্থহীন সর্বরিক্ত জীবনে সমর্পিত হয়। ব্যাকরণ-ভাঙা জীবনের দুর্বহ ভার নিয়ে সাবিত্রীর চিন্তা জগৎও বিশৃঙ্খলতায় আকীর্ণ। উপাখ্যানের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে আছে সাবিত্রীর বিশৃঙ্খল চিন্তার ছাপ। প্রকৃতির পরিচর্যায় বিচূর্ণিত-ভাবনা পেয়েছে নতুন ব্যঞ্জনা; এরই একটি নমুনা :

"সাবিত্রীর একবারও মনে পড়ল না তাকে দুপুরে খেতে বলল না, এক থালা ভাত তার সামনে ধরল না– সে, আমি কখনো হেঁসেলে ঢুকব না, আঁতুড় ঘরে যাব না, ছেলেকে মাই খাওয়াব না– দোর লাগানো ছোট বুকচাপা একটা ঘরে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে ঘরের কোণে, হাড়িবউ বাচ্চার নাই সেঁকছে আঙুলে সরষের তেল লাগিয়ে পিদিমের তাপ নিয়ে নিয়ে। দপ্ দপ্ করে করে জ্বলছে লম্ফ, আগুন লাফাচ্ছে মাঝে মাঝে, কালো ধোঁয়া উঠছে কাঁপতে কাঁপতে, ঘরের চাল থেকে কালিঝুল ঝুলছে, কাঠপোড়া গন্ধ, তেলপোড়া গন্ধ, চিটচিটে কাঁথার গন্ধ, গুড়ের গন্ধে ভরে আছে সারা

ঘর। একপাশে পড়ে আছে কাঠমরা বাসিগন্ধের একটা শাড়ি-ঢাকা মেয়েমানুষের দেহ।... আমি দেখিনি, আমি জানি না, ঐখানে মরা শুয়ে ছিল নিশ্চয়ই, ঐ দেহের ভেতর থেকেই আমি মাটিতে পড়েছি, আমাকে নামিয়ে দিয়েই চিৎ হয়ে শুয়ে চিরকালের জন্যে চোখ মুদেছে। শাড়ি-ঢাকা মুখটা আর কেউ কোনোদিন দেখেনি। ও মা কেন? ও মা কেন? হাড়িবউ ওকে দেখো... এই কথা কি বলেছিল হাড়িবউকে– কই হাড়িবউ কোনোদিন আমাকে বলেনি... তবে কি মা ছাড়াই জন্মেছি– কোন্ প্রেত আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি এই পিথিমিতে? তবে কি এত দিনে নিজের জায়গায় এলাম? কালো রঙের একটা কাপড় কি পর্দা যা-ই হোক সামনে এল সাবিত্রীর–স্পষ্ট সব দেখা যাচ্ছে সেখানে–কঙ্কালের তৈরি শরীরে হাঁটছে, নিজের হাত পা খুলে মাটিতে ফেলে সেখানে বসে মহা দোটানায় পড়ে ভাবছে। সব আছে, শুধু শব্দ নেই। কতো জিনিস দেখতে পাচ্ছে, একটাও চেনে না। ওসব জিনিসের নাম এখনো আমি শিখিনি।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৬৪)

জীবনের অর্থহীনতা আর পাশবিকতার যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে সাবিত্রী বহু দিন মরে যেতে চেয়েছে : "কেমন করে জীবন ছেড়ে চলে যাওয়া যায়, বেঁচে-থাকা ছেড়ে দিয়ে মরণের মধ্যে ঢুকে পড়া যায়? কোনোদিন কি তা হতে পারে?" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৫৪) সাবিত্রী নিজেকে হত্যায় সবুর, সৈয়দ, দুর্গাপদদের প্ররোচিত করে; আত্মহননের প্রচেষ্টা হিসেবে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আগুয়ান ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তদুপরি মরতে চাইলেই সাবিত্রী মরতে পারে না, তার অফুরান প্রাণ মরে না, মরতে মরতে সে বেঁচে ওঠে; শ্মশানের চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে সাবিত্রীর এই বেঁচে উঠা : "দাহ শেষে অস্থিমাংসমজ্জা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ধিকিধিকি যে-আগুন জ্বলে ছাইগাদায়, তার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে থাকে নাভিকুণ্ডলিটি! ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে পুরোপুরি আগুন নিভিয়ে শ্মশানবন্ধু আর চাঁড়ালরা, তবু লুকিয়ে থাকে নাভিপিণ্ড ভেজা কালো ছাইয়ের আড়ালে। তারপর জাগে। ফিরিয়ে দে আমার তনু, ফিরিয়ে দে, আরো বাঁচব, অস্থিমাংসমজ্জা ফিরিয়ে। এই যে জটলা পাকিয়ে আমি রয়েছি আমারই নাভিমূলে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৩৯)

প্রকৃতির নিয়মে বেঁচে থাকতেই হবে, তবে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে সাবিত্রীর বেঁচে থাকা হবে না। ধর্ষণে নষ্ট হয়ে-যাওয়া শরীর নিয়ে সমাজের কেন্দ্রে আর তার ফেরা হবে না, ফিরতে চায়ও নি, কেবল চেয়েছে ধর্ষণমুক্ত আত্মগোপন উপযোগী একটি নির্জন পরিবেশ। বষ্টোমির সঙ্গে কথোপকথনে ফুটে উঠেছে তার ভগ্নহৃদয়ের মর্মছেড়া অভিপ্রায় : "বষ্টুমি মামি, একবার ফিরতে পারলে আমাকে আর আর কেউ দেখতে পাবে না, আমি পিথিমির কোনো মানুষ দেখব না, আমাকেও কেউ দেখবে না।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৮৪)

শাশ্বতকালের বাঙালির প্রাণের গভীরে লুক্কায়িত রয়েছে মরণ-জয়ের অবিনাশী বীজ। সাবিত্রী ক্ষত-বিক্ষত, রক্তঝরা শরীর নিয়ে নবীন প্রাণে বেঁচে উঠার অনুপ্রেরণা পেয়ে

যায় হাজার বছরের বাঙালি চেতনার শিকড়ে নিহিত চিরায়ত প্রেমের রসোপলব্ধির শক্তির মধ্যে। বাঙালি নর-নারীর মানস-জগতে নিহিত দেহোত্তীর্ণ প্রেমের চিরায়ত বোধের জারণে গড়ে উঠেছে চণ্ডীদাসের অমর কাব্য। অশত্থবৃক্ষের প্রতীকে অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে বাঙালির চিরায়ত মানবিক চেতনা : "দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবার চেনা কতকালের পুরনো বিশাল অশথগাছটা। রামী চণ্ডীদাসের কাপড়-কাচা ঘাট। গাছটাকে বুড়োশিব বলেও ডাকে এখানকার মানুষ। তিনপুরুষ ধরে এখনো যারা বেঁচে আছে, তাদেরও কেউ জন্মাতে দেখেনি গাছটাকে। একরকম আছে চিরকাল। প্রকাণ্ড গুঁড়িতে শুধুই গেঁটেবাতের মতো বড় বড় গিঁট। এর তলার ঘন ছায়ায় আর রাতের অন্ধকারে ঘাস জন্মাতে জন্মাতে ক্লান্ত হয়ে এখন আর জন্মায়ই না। তবে এর আশেপাশে বঁইচি আর বনকুলের ঝোপের দৌরাত্ম নেই। একটু দূরে নরম লতাপাতায় ঢাকা সুড়িপথ নেমে গিয়েছে অজয়ের দিকে।" (হাসান আজিজুল হক ২০১৩:পৃ. ৪২) এই প্রেমবোধই বাঙালির মানস থেকে মুছে দিয়েছে সকল প্রকার জান্তব পাশবিকতা; রিপুর আগ্রাসন থেকে চেতনাকে মুক্ত করে থিতু হয়েছে মানবিক মূল্যবোধে – উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে আমরা তারই প্রতীকী ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করি। অবক্ষয়িত সময়ের আসুরিকতায় বাঙালির সেই শাশ্বত চেতনা অবক্ষয়িত হয়েছে, ভোগের উত্তপ্ত লাভা প্রবেশ করেছে বাঙালির চৈতন্যে; সেই লাভা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে বাংলার মানবিক জমিন। কিন্তু এই মানবিক চেতনা অনিঃশেষ, কোনো অসুরের দানবীয়তাই তাকে ধ্বংস করে দিতে পারে না। তাই দেখি, অশত্থবৃক্ষের তলায় ধর্ষকদের দানবীয়তায় যখন থেতলে যাচ্ছিল সাবিত্রী, তার শুকনো যোনিতে চলছিল ধর্ষণের প্রবল যন্ত্রণা, তখনো সাবিত্রীর মগ্নচৈতন্যে ক্রিয়াশীল ছিল প্রেমের সেই শাশ্বত চেতনা। প্রকৃতির অসাধারণ প্রতীকী ব্যবহারে তারই প্রতিফলন :

> "সাবিত্রীর সিথানের দিকে অজয়, ওর সিঁথির সোজাসুজি সিঁথির মতোই সাদা সুঁড়িপথটা : কিছু গন্ধ আসছে, মানুষের বিষ্ঠা আর বনজুঁইয়ের একটা মেশা গন্ধ –
> চাঁদের আলো এখানে-সেখানে পড়ে আছে। সাবিত্রী কিন্তু চেয়ে আছে হেমন্তের শেষ বেলার সুয্যির দিকে।" (হাসান আজিজুল হক ২০১৩:পৃ. ৪৬)

'চাঁদের আলো' এখানে ধর্ষণ-মুহূর্তের রূপক আর 'হেমন্তের শেষ বেলার সুয্যি' চণ্ডীদাসের চিরায়ত প্রেমের মুহূর্তটিকে ধারণ করে আছে। লক্ষণীয়, প্রথানুগত্য ভেঙে দিয়ে বিনির্মিত জীবনবোধের অনুষঙ্গে 'চাঁদ' এখানে রুদ্র আর 'সূর্য' হয়ে উঠেছে স্নিগ্ধ ।

চণ্ডীদাসের অমর প্রেমের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে দেহোত্তীর্ণ প্রেমের অবিনশ্বরতার মর্মবাণী। রক্ত-মাংসে গড়া দেহ নশ্বর, প্রকৃতির নিয়মে দেহে ক্ষয় ধরে; আবার পাপের স্পর্শে দেহের বিনাশ ঘটতে পারে; কিন্তু দেহের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বিমূর্ত মন তার শুচিতায়, শুদ্ধতায়, পবিত্রতায় অবিনশ্বর। প্রেমে স্নাত হয়ে মনকে শুচি করার মধ্য দিয়ে শুচি-শুভ্র হয়ে ওঠে পাপপূর্ণ দেহ। কোন সুদূর কালের হেমন্তের বিকেলে রামীকে উদ্দেশ্য করে চণ্ডীদাসের সংলাপে ফুটে উঠেছে চিরায়ত প্রেমের মহিমা : "তুমি জানো

না, দিনরাত প্রক্ষালন করে চলেছ তোমারই মন, যা বেঁচে আছে বলে শরীর বেঁচে আছে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৪৭) মনের তলানিতে জমা হয়ে থাকা এই চিরায়ত প্রেমের সঞ্জীবনীশক্তিই পাশব অত্যাচারে বিক্ষত সাবিত্রীকে অবচেতনে জীবনলগ্ন থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে।

উপন্যাসে সাবিত্রীর সংলাপ তো প্রায় দুর্লক্ষ; আছে কেবল অন্তর্ময় আত্মভাবনা। সমাজ-অন্তর্গত শব্দময় পৃথিবীর সঙ্গে সাবিত্রীর আর কোনো যোগ নেই; তাই নৈঃশব্দ্যের ভেতরে অবস্থান করেই সাবিত্রী শব্দময় পৃথিবীর সন্ধান করেছে : "নিস্তব্ধতার সঙ্গত শব্দ। শব্দেই স্তব্ধতা নির্দিষ্ট রূপ পায়। একগাদা প্যাঁচা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে একসঙ্গে ডেকে উঠল, কতোদূরের কোনো জঙ্গুরে পুকুর থেকে হঠাৎ কোলাহল করে উঠল ডাহুকের দল, মাথার ওপর দিয়ে শন শন শব্দে উড়ে গেল একটা বড়ো বাদুর, কানে ঝালাপালা ধরিয়ে দিল ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের ডানাঘষার টানা কির্‌কির্‌ আওয়াজ। এরা যেন সবাই সঙ্গতের কাজ করছে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১১৯) অনস্তিত্বের উপস্থিতিতেই অস্তিত্ব বাঙ্ময় হয়ে ওঠে — দেরিদা-কথিত এই দর্শন এখানে শৈল্পিক বাঙ্ময়তা পেয়েছে প্রকৃতির পরিচর্যায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন নৈঃশব্দ্যের পটভূমিতে নানামুখী ভাবনা ও জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাবিত্রী নিজের ভেঙে পড়া জীবনের গতিপথ সন্ধানে ব্যাপৃত হয় : " দেহে যখন কিছু থাকে, দেহই সেটা মনে করিয়ে দেয়, দেহ থেকে বিদায় নিলে আর নেই। তার দেহে যা কিছু তাণ্ডব ঘটে গিয়েছে, তাতে তার কি হয়েছে? সে কি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, না, সে যেমন ছিল, যা ছিল, তেমনি আছে, তাই আছে? সেই যে সাবিত্রী সে অটুট আছে, অক্ষত, শুদ্ধ আছে। তার বুকে কামড়ের দাগ আছে, তার উরুর ভেতরের দিকে নখের আঁচড়। তার যোনি ছিন্নভিন্ন তছনছ হয়ে গিয়েছিল মাত্র, জঙ্গলের বাঘ এসে একটা থাবায় তার একটা বুক ছিঁড়ে নিয়ে গেলে বা কামড়ে যোনিটাকেই ছিঁড়ে নিয়ে গেলে কি হতো তার? পিথিমির যা কিছু যেখানকার তেমনি আছে। সাবিত্রীর মতো তার মন থাকলেও যা, না থাকলেও তাই। কেন সে মরে গিয়েছে মনে করছে, কেনই বা কখনো কখনো নিজেকে মেরে ফেলতে চাইছে ?... বেঁচে-থাকা মানুষ লড়াই করে, প্রতিকার করে, নিরুপায় হয়ে গেলে ঘটনা যা ঘটার ঘটে যায়, আত্মরক্ষা করতে না পারলেও মেনে নেয় না, হার স্বীকার করে না।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১২০)

পশুদের হিংস্রতা থেকে সাবিত্রী নিজের দেহটিকে রক্ষা করতে পারেনি, কিন্তু 'পাথুরে অনাসক্তি' দিয়ে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে পাশবিক কামনাকে। পশুদের নখরের আঘাতে আঘাতে এক ভয়ানক বোবা-কান্না বুকে জমাট বেঁধে একটি কোমল 'পদ্ম' পাথুরে ভাস্কর্যে পরিণত হয়ে যায় : "পাথরের ভাস্কর্যে চোখ আঁকা কিন্তু দৃষ্টি নেই। পলক নেই।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৩৮) যে বীভৎস অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সাবিত্রীকে যেতে হয়েছে, সেই মাংস-খেকোদের ভিড়ে নিজের অন্তর্গত ভয়ানক যন্ত্রণার কথা নিজের ভেতরে গুমরে মরেছে; একটু আশ্রয়, একটু বরাভয় কোথাও ছিল

না। সৈয়দের সাহচর্যে সামান্য অবকাশে সেই জমাট পাথর গলে যেতে থাকে। এই সুবাদে আমরা পেয়ে যাই কান্নার এক অসাধারণ চিত্রকল্প : "সৈয়দ তার জ্বালাভরা চোখ দিয়ে সাবিত্রীর চোখ দুটিকে অল্প আঁচে ননীর মতো গলে যেতে দেখে। সেই আঁচে সেও গলতে থাকে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৩১) তার এ কান্নার অশ্রুতে আসলে ধুয়েমুছে শুচি-নির্মল হয়ে উঠেছে পশুতে খাওয়া তার ছিন্নভিন্ন দেহ। তাই ঘন অন্ধকার রাত্রির শেষে নতুন অরুণোদয়ে সাবিত্রী পেয়ে যায় নতুন করে বাঁচার প্রেরণা : "পূবদিকের আকাশের নিচে একটা গোলক থেকে গোলাপি লাল আলো এই ভূ-ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে, শীতে কুঁকড়ে-যাওয়া লতাপাতা, মরা-মরা ঘাস, ফোঁপরা ধুলোটে মাটি সেই আলো যেন ঝিম ঝিম সিম সিম শব্দে শুষে নিচ্ছে। ঘন ঝোপঝাড়ের তলার ঘন ছায়া হালকা হয়ে আসছে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১২০) প্রকৃতির অসাধারণ উপমায় বিধৃত হয়েছে জীবনের ক্লেদাক্ত অধ্যায়কে পিছনে ফেলে সাবিত্রীর জীবন্ময় হয়ে উঠার গভীর অভীপ্সা : "সাবিত্রী সদ্য যুবতী, অথচ তার নিজের রসভাণ্ডারের কোনো স্বাদ পায়নি, এরই মধ্যে পেয়ে গিয়েছে জরতীর জীবন, তবু সে কোথাও হয়তো নিশ্চিত জানে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে যে কচি গাছ, সে শুকিয়ে জ্বালানি কাঠ হতে হতে শুধুমাত্র মাটিতে পড়ে থাকার সুযোগ পেলেও আবার তার শুকনো ডালে নতুন পাতা দেখা দিতে পারে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১২৪)

সাবিত্রীর ভার বহন করতে করতে ক্লান্ত, শ্রান্ত বিধ্বস্ত সবুর এক পর্যায়ে সাবিত্রীকে মধ্যরাতের নির্জনতায় বর্ধমান শহরে ফেলে রেখে পলায়ন করে। সবুরের এই পশুসুলভ পলায়নে সাবিত্রী অনুভব করে মুক্তির এক গভীর অনুভূতি; এক নিঃশ্বাসে বের করে দেয় ধর্ষণে ধর্ষণে শরীরের কোষে জমে উঠা বিষ। এই মুক্তির পটে সাবিত্রীর মনে জন্ম নেয় এক অভূতপূর্ব দেহোত্তীর্ণ জীবনবোধ : "অদ্ভুত কথা সাবিত্রীর মনে হলো। এখন আর শরীর নেই। খুব সাধের শরীর, কতো পাওনা তার, কিছু না পেলে কি ভয়ানক ক্ষিধে, কি ভয়ানক তৃষ্ণা, সেই শরীর তার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ধ্বংস করে দিয়েছে মানুষ। এখন আর তার সেটার দরকার নেই। এইসবের মধ্যে যেখানে সে সাবিত্রী সে এখন মুক্ত। হাজার দরজা তার আর পৃথিবীতে এখন এত হাওয়া!" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ২০৫) এভাবে সাবিত্রীর মধ্যে পশুশক্তির বিরুদ্ধে মানবসত্তার পরাভব না-মানার যে দুর্জয় মানসিকতার পরিচয় পাই, তা আমাদের সদর্থক মানবিকচেতনাকে গভীরভাবে আশ্বস্ত করে। সাবিত্রীর পোড়-খাওয়া জীবনবোধের লগ্ন হয়ে আমরা জেনে যাই চূড়ান্ত বিজয় পাশবিকতার নয়, এ বিজয় কেবল শুভবোধ-লালিত মানবতার।

৪.৬

সাবিত্রী উপাখ্যান-এ লক্ষ্যহীনভাবে কেবল ধর্ষণচিত্র উপস্থাপন ও সাবিত্রী নামের একজন ব্রাহ্মণ-কন্যার করুণ জীবনের কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরার মধ্যেই ঔপন্যাসিকের প্রয়াস সীমাবদ্ধ হতে পারে না — একটি ভিন্নতর বিনির্মিত তাৎপর্যে উন্নীত হওয়া সম্ভব না হলে তো এটি একটি শিল্পহীন করুণ বয়ানে পর্যবসিত হবে মাত্র।

দেশকালের বৃহৎ পটভূমিতে ধর্ষিত সাবিত্রীকে টেনে এনে সমকালীন সমাজ ও দেশের পরিস্থিতির অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ পরিমাপের একটি প্রয়াস আলোচ্যমান উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। "সাইত্রিশ সালের পৌষ থেকে আটত্রিশের আশ্বিন-কার্তিক পর্যন্ত ন'-দশ মাস ধরে যে সময়টায় সাবিত্রী নিখোঁজ ছিল সেই সময়টায় অসন্তোষ কতোটা ধুঁইয়ে উঠেছিল?"(হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৬২) — তারই ওপর নির্ভর করে ঔপন্যাসিক তার উপন্যাস-সত্যে উপনীত হতে চেয়েছেন। তাই লেখক অসাধারণ চিত্রকল্পে দেন সাবিত্রী-অপহরণের ঘটনার প্রতিক্রিয়া সমাজে ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত : "হোক ডোবার জলে ছোট্ট একটা ঢিল তবু ঢেউ দুটো-একটা উঠবেই।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৬০) বাংলায় উপনিবেশায়ন ও এর বিরূপ প্রভাব নিয়ে একটি পর্যালোচনা এই উপন্যাসের কাহিনী-কাঠামোতে একটি স্বতন্ত্র স্বর রূপে সক্রিয় আছে এবং স্মর্তব্য, এটিই লেখকের অভীষ্ট কেন্দ্রীয় স্বর।

পশুসুলভ প্রবৃত্তির তাড়নায় একজন ব্রাহ্মণ-কন্যাকে অপহরণ ও ধর্ষণের পরিণাম কতটুকু গড়াতে পারে তা সংশ্লিষ্ট নরপশুদের ভাবনার মধ্যে ছিল না। জেল আর ফাঁসির ভয় যখন তাদের পেয়ে বসে, তখন তারা আত্মরক্ষার্থে পশুর মতোই পালানোর পথ সন্ধান করে। কিন্তু বন্য পশুদের যেমন চলার পথ থাকে না, তেমনি তাদের চলার পথও হারিয়ে গেছে। প্রবৃত্তির জালে তারা আটকে গেছে, "কী কথা বলছিস দুগ্‌গা। একে এখন আস্তাকুঁড়েও ফেলা যাবে না। দুদিন পরে আবার ঠিক খাই-খাই করে উঠবি।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৪৮) পরিস্থিতির সঙ্গে নরপশুদের আটকে যাওয়ার চিত্র প্রকৃতির পরিচর্যায় নিপুণভাবে প্রকাশিত : "এই জায়গাটা যাচ্ছেতাই। আটকে গিয়েছে তারা। চিলের নখের মতো বাঁকা বাঁকা কাটায় ভরা বঁইচিগাছের জঙ্গল, আঁকশিকাঁটা তো আছেই। বনকুলের জঙ্গলও খুব ঘন। এগোতে গেলেই কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে, মাঝেমধ্যে উরু থেকে চামড়াও খিঁচে নিচ্ছে খানিকটা করে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৪২) এটি কেবল প্রকৃতির শব্দচিত্র মাত্র নয়, এই প্রকৃতি চিত্রের আগল ভেঙে বিনির্মিত প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পরিস্থিতির সঙ্গে গেঁথে গিয়েছে। দুর্গাপদের প্ররোচনায় ও নেতৃত্বে সাবিত্রী অপহরণ ও ধর্ষণের নারকীয় ঘটনাটি ঘটলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই দুর্গাপদ দ্রুত তার মদমত্ত লোভের মুখে লাগাম পরায়; সবুরের হাতে সাবিত্রীকে তুলে দিয়ে হাত-পা ঝেড়ে ফেলে। এর আগেই দুর্গাপদের উন্মত্ত পাশবিকতায় বটকৃষ্ণের মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটে : "বটা বলে তুই কি মানুষ রে দুগ্‌গা? মানুষ গরু-ছাগলকেও জল দেখায় নিয়ম করে, পথের কুকুরও জল খেতে পায়। মেয়েটা জল-জল করে করে তালু শুকিয়ে মরছে, সামনেই পুকুরের জল, গরু-মোষের মতো না হয় ওকে খেদিয়ে জলে নামিয়ে দে। কতটা সময় যাবে র‍্যা?" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৫৭) আর এই বিবেকী জাগরণেই বটকৃষ্ণ নিজেকে গুটিয়ে নেয় ধর্ষণের মঞ্চ থেকে : "এত চাঁদের আলো, তবু সে একটুও কোথাও থামল না, চাঁদের আলোয় উবে গেল।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৫৮)

নিজের ইচ্ছেমতো সাবিত্রীর অনুপম দেহটিকে যখন তখন ভোগ করার অসংযত প্রবৃত্তির তাড়না থেকে সবুর সাবিত্রীকে নিজের জিম্মায় নেয়। সাবিত্রীকে সবুরের জিম্মায় দেওয়া লেখকের ঈপ্সিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল।

সাবিত্রী অপহরণে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার লেশমাত্রও ছিল না, ছিল কেবল মানুষের পশুপ্রবৃত্তির দুর্দমনীয় লোভ। দুর্গাপদ, বটকৃষ্ণরা যখন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লোভ সংবরণের পরীক্ষায় উতরে গেছে, তখন সবুর হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে লোভের নিগড়ে আপাদমস্তক আটকে গেছে। প্রবৃত্তির পরবশতার কারণেই সবুর সাবিত্রীকে নিজের জিম্মায় নেয়, পরিবার ও সম্প্রদায়ের কাছে সাবিত্রীকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য হাত থেকে শাখা-নোয়া খুলে, সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে সাবিত্রীর কৃত্রিম ধর্মান্তরণ ঘটায় আর একটি বিয়ের নাটক সাজায়। এতে আগেই তেতে থাকা হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক আরো উত্তপ্ত হওয়ার জ্বালানি পায়। সবুরকে উদ্দেশ করে বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৈয়দ সয়ীদের উক্তিতে তারই আভাস : "এলাকায় হিঁদু-মুসলমান দাঙ্গা হয়ে যেতে পারে। ভদ্দরলোকেরা তাই চায়। ওরা শুধু ফন্দি-ফিকির খুঁজছে। ভালো একটা ফিকির বানিয়ে দিয়েছিস।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১১৩)

সাবিত্রী অপহরণের সময়টিতে বাংলায় উপনিবেশায়নের কুফল বিষের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। উপনিবেশায়নের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে জমে উঠেছিল এই বিষ। উপনিবেশায়নের শুরুর লগ্নে অনুকূল শক্তি হিসেবে ব্রিটিশ উপনিবেশকরা আনুকূল্য দেখিয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশবিশেষকে। মোগল শাসকদের হটিয়ে দেওয়ার পর ইংরেজরা পুনর্বিন্যস্ত ভূমি-ব্যবস্থাপনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা জারি করে। উপনিবেশ-রক্ষার কৌশল পরিবর্তনের অংশ হিসেবে সেই ক্ষমতা-কাঠামোতে মুসলমানরা ঢুকে পড়লে তাতে মুসলমানদের সঙ্গে পুরনো অভিজাতদের তৈরি হয় একটি স্বার্থগত দ্বন্দ্ব। এমত লাভাময় উত্তপ্ত পরিবেশে ঘটে গেছে সাবিত্রী অপহরণ ও সবুর কর্তৃক ধর্ষণ ও বামুন-কন্যার জাত-হরণের মতো জঘন্য ঘটনা। ধুমায়িত হয়ে ওঠে পরিবেশ। অসাধারণ উপমায় ধরা পড়ে সেই পরিবেশ-চিত্র : "এলাকাটা ধোঁয়াতে শুরু করেছে। ঠিক পর্বত বহ্নিমান ধূমাৎ-ধোঁয়া থেকেই বোঝা যায় পর্বত জ্বলছে– এমন হয়তো নয়। শুধু ধুমই দেখা যাচ্ছে হতে পারে। গোয়াল থেকে মশা তাড়াবার জন্যে যখন আগুন নয়, স্রেফ ধোঁয়া দরকার হয়, তখন গেরস্থ খড়টাকে অল্প করে ভিজিয়ে আগুন দেয়। তাতে আর সহজে আগুন জ্বলতে পারে না, ধোঁয়াই বের হয়।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৬৭) রাঢ় বাংলায় ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবের ভয়াবহতার উপমায় ধরা পড়ে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার ঘনীভূত সংকটের তীব্র রূপ :

> "এই এলাকার মানুষ জানে, ম্যালেরিয়া জ্বরটা পুরনো হতে হতে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, রক্তের রং-ই কালো হয়ে ওঠে। জ্বর তখন ছাড়ান দিয়েও ছাড়ান দেয় না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আসে, দুপুরবেলা কপালটা পুড়ে যেন কয়লা হয়ে যায়, সন্ধেয় ছেড়ে যায় শুধু পরদিন আবার আসবে বলে।

> জ্বর আরো পুরনো হয়ে শেষ পর্যন্ত সারা দিনমানই ঘুষঘুষে জ্বরে গিয়ে দাঁড়ায়। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে, মাথা ভোঁ ভোঁ করে, কান আর কিছু শুনতে পায় না। এইরকম করেই ঘুষঘুষে জ্বরের বিষ ঢুকে পড়ল মানুষের মনে। কালকেউটের কুচকুচে কালো বিষ : সমস্ত হিন্দু এক হও যদি বাংলায় বাঁচতে চাও, সমস্ত মোসলমান এক হও যদি ধম্মকম্ম বাঁচাতে চাও, মিয়ে-মোকাদিম, সৈয়দ, আয়মাদার, চাষী মোসলমান সবাই একাট্টা হও। বামুন, কায়েত, শুদ্দুর, তিলি, চাষাভুষো হিঁদু কোথাও কিছু তফাৎ নেই। হাড়ি বাগদি ডোম অচ্ছুৎ তোমরাও আর আলাদা থেকো না–সবাই এক হও। এলাকা জুড়ে বাতাস তেতে উঠতে থাকে। বামুনের মেয়ে সাবিত্রী মোসলমানের হাত থেকে মোসলমানের হাতে বদল হচ্ছে, যতোদূর জানা গিয়েছে তার শঙ্খ-নোয়া কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়েছে, গো-মাংসও খাওয়ানো হয়েছে।" (হাসান আজিজুল হক ২০১৩:পৃ. ১৫৯)

এখানে ম্যালেরিয়া জ্বর লেখকের নিপুণ বর্ণনার গুণে প্রথমে প্রকৃত স্বরূপে উপস্থাপিত হয়; এরপরই আভিধানিক অর্থকে মোচড়ে দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের বিনির্মাণ প্রয়াসে দেশকালের গভীর সংকট অভিব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে।

আত্মস্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব-রক্ষার হুজুগ তুলে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় নিজেদের ভেতরে সংগঠিত হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয় এবং এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সাবিত্রী হরণের প্রতিক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দানা না বাঁধলেও গুপ্তহত্যা ছড়িয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিকের ভাষ্যে ধরা পড়ে পরিস্থিতিটি : "মনে হতে লাগল যে প্রতিদিনই একটি করে লাশ হবে ভোরবেলার উপহার। তাহলে কবে থেকে দেখা যাবে চোখের সামনেই পড়ছে একটির পর একটি লাশ? লাশ ফেলতে হচ্ছে, লাশ হতে হচ্ছে কিংবা লাশ ফেলার কোনো ইচ্ছে না থাকলেও লাশ হয়ে যেতে হচ্ছে। কোথাও লুকুতে পারা যাচ্ছে না।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১৭৯) হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিদ্বেষে এভাবেই বাঙালির চিরায়ত মানবিকতাবোধ ভূলুণ্ঠিত হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপনিবেশী ব্রিটিশ শাসনের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার অকার্যকারিতা আর উপনিবেশপোষিত সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ার দিকটি ছিল লক্ষণীয়। সাবিত্রী অপহৃত হওয়ার পর সমাজে ব্যাপক আলোড়ন আর দুই বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু হলেও রাষ্ট্র ছিল প্রায় নির্বিকার। সাবিত্রী উদ্ধার আর অপরাধীদের শাস্তিবিধানের ব্যাপারে রাষ্ট্রের ছিল গা-ছাড়া ভাব। রাষ্ট্রের যতটুকু নড়াচড়া সাবিত্রীর হদিস পাওয়ার পরে। সাবিত্রী উদ্ধার হয় "পুলিশ গোয়েন্দার বাহাদুরিতে নয়, সাবিত্রীর আত্মীয়বর্গের চেষ্টার ফলেও নয় – এমনকি সাবিত্রীর নিজের শক্তিতেও নয়, যারা তাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের ঘাড় যখন নুয়ে পড়েছে, কোথায় রাখি এ বর্জ্য, এই নিরেট পাষাণভার–তখন তারাই তাকে আবর্জনার মতোই ফেলে দিয়ে গিয়েছে। সাবিত্রীর ফেরার খবরে তার গাঁয়ের টকটকে সিঁদুর-পরা বৌ-ঝিরা মুখ বেঁকিয়ে বলেও ফেলতে পারে : সাবি আপনা-আপনি ফিরে এসেছে কুল খুইয়ে।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ২০৮)

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের কখনো কোনো স্থায়ী মিত্র ছিল না, শত্রু-মিত্রের বিষয়টি ছিল তাদের উপনিবেশ নীতির অংশ। সুকৌশলে তারা মুসলমানদের ওপর শোষণ-জুলুম ও নির্যাতনের সকল দায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ করে তুলেছে। ইংরেজদের কূটকৌশলে দীর্ঘদিনের সম্প্রীতির ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে এই দুই সম্প্রদায় পরস্পর স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিরকালের শত্রুতেও পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, উপনিবেশক ইংরেজদের চাওয়াটাই উপনিবেশিত বাংলার মানুষের জন্য নিয়তি-স্বরূপ; বাঙালি জনগোষ্ঠী কেবল ক্রীড়নকের মতো তাদের চাওয়াটাকেই পূরণ করে গেছে মাত্র। ইংরেজদের চাওয়া অনুসারে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিভাজিত একটি সমাজ আমরা পেয়েছি। এটি ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাব। ঔপনিবেশিক শাসনের পরোক্ষ প্রভাবে বাঙালি সমাজের ভিতর কাঠামোতেও ধরেছিল সর্বগ্রাসী ভাঙন, এক সর্বক্ষয়ী পচন। অন্যের সম্পদের ওপর ঔপনিবেশিক লোভ আমাদের চিরায়ত শুভবোধকে ধ্বংস করে দিয়েছে; শঠতা, প্রতারণা ও কুটিল চাতুর্যকে আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাঙালির নিজস্ব মূল্যবোধগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে সেখানে ছড়িয়ে দিয়েছে লোভ ও দস্যুতার সংস্কৃতি।

৪.৭

আধুনিক সাহিত্যে মিথের ব্যবহার হয় তার প্রচলিত অর্থের খোলস ভেঙে বক্তব্য বিষয়কে নতুন কোনো ব্যঞ্জনায় উপনীত করার অভিপ্রায়ে। উপন্যাসে কতগুলো নারী মিথের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ লক্ষ করা যায়। নাম-চরিত্রটিই তো বিখ্যাত সাবিত্রী মিথের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া সীতা, দ্রৌপদী ও শকুন্তলা মিথের উল্লেখও একাধিকবার হয়েছে। পঞ্চপতির সংসার করেও সতীত্বের মহিমা অটুট থাকার দৈবীবাণীর আশীর্বাদ দ্রৌপদীর মতো সাবিত্রীর ছিল না; অন্তহীন শাড়িতে দ্রৌপদীর মতো সাবিত্রীকে আচ্ছাদিত করে দেওয়ার জন্য কোনো দৈবীশক্তিও ছিল না, বরং উপনিবেশিত মানুষদের জন্য নিয়তি হয়ে ওঠা উপনিবেশক শক্তি ধর্ষকদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সক্রিয় ছিল। ধর্ষকদের সামনে বার বারই তাকে উদোম হতে হয়েছে। দ্রৌপদীর মতো অশুভশক্তি নাশের জন্য অসীম শক্তিশালী পঞ্চপাণ্ডবও সাবিত্রীর ছিল না; বরং সাবিত্রীর স্বামী ভয়ানক নিরীহ, ক্ষুধার প্রহারে জর্জরিত। যে স্ত্রীকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, নিজেকে রক্ষা করতেই অপারগ। প্রবল বৈরী পরিবেশে বহু নরপশু দ্বারা ধর্ষণে ধর্ষণে বিপর্যস্ত হয়েও দ্রৌপদীর মতোই অন্তর্নিহিত সতীত্বের মহিমায় সাবিত্রী অনশ্বর সাধ্বী। এখানেই পুরাণের দ্রৌপদীর চেয়েও উপনিবেশের সাবিত্রী অনেক বেশি মহিমময়।

পুরাণের শকুন্তলার বিনির্মিত আধারে ঔপন্যাসিক *সাবিত্রী উপাখ্যান*-এর বাস্তব সাবিত্রীকে গড়ে তুলেছেন। "ছেঁড়াখোড়া শকুন-খাওয়া হলেও মা তাকে ঠিক লুকিয়ে ফেলত" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৪৮) 'শকুন এসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে' (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ৪৯) — ইত্যাকার বাক্যাংশের আশ্রয়ে এ উপন্যাসে বার বারই

এসেছে শকুন প্রসঙ্গ। আর শকুনের সঙ্গে পুরাণের শকুন্তলার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। পিতা 'ঋষি বিশ্বামিত্র' ও মাতা 'অপ্সরা মেনকা' যখন সদ্যোজাত কন্যাকে ফেলে নিজ নিজ গন্তব্যে প্রত্যাবর্তন করে, তখন শকুনরাই ছায়া দিয়ে তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। তাহলে পুরাণে শকুনের ভূমিকা রক্ষাকারীর। আর শকুন প্রাণীটি দেখতে যত কদাকারই হোক আর তাদের মাংস টেনে খাওয়ার দৃশ্য যত বীভৎসই হোক না কেন, তারা কখনো জ্যান্ত প্রাণী খায় না, মৃত প্রাণী খেয়ে পরিবেশকে রক্ষা করে। বাস্তবেও তাহলে শকুনের ভূমিকা রক্ষাকারীরই। ধর্ষক নরপশুদেরকে শকুনের সঙ্গে উপমিত করে শকুন মিথটিকেই ভেঙেচুরে দেওয়া হয়েছে; কারণ এখানে শকুনেরা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, আগ্রাসী, জ্যান্ত মানুষকে তারা খুবলে খায়। এই শকুন লেখকের বোধ নির্মিত 'বিনির্মিত' শকুন। আর পুরাণের শকুন্তলা মাতৃ-পিতৃহীন হলেও পিতা হিসেবে পায় কণ্বকে, স্বামী হিসেবে মহারাজ দুষ্মন্তকে, সন্তান হিসেবে পায় মহাবীর ভরতকে, যে কিনা ভারত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, স্বর্গে ফিরে পায় মাকেও। তবে তার জন্য তাকে অবশ্য প্রেমে নিষ্ঠা আর কঠিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। উপন্যাসের সাবিত্রীর জীবন সর্বরিক্ত, যার মা নেই, বাবা নেই, সংসার নেই, সন্তান নেই। অথচ শকুন্তলার মতো তার সুন্দর তনু ছিল, সংসার-সন্তানের স্বপ্ন ছিল, সতীত্বের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষাও ছিল। সবই এক, শুধু সময়টা আলাদা। শকুন্তলা সনাতন ভারতের মূল্যবোধ লালিত সময়ের মানুষ, যেখানে নারীর দেহ ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়ার হিংস্রতা ছিল না; আর সাবিত্রী উপনিবেশিত আসুরিক সময়ের বাসিন্দা, যেখানে লোভ সাপের মতো মাথাটা ডানে-বামে বাঁকিয়ে ঠাণ্ডা হিংসায় জিভ বের করে চলে।

পুরাণের সাবিত্রী সতী, সাধ্বী, তেজস্বী, স্বয়ম্বরা; আপন নিষ্ঠা আর একাগ্রতায় সে তার শ্বশুর দ্যুমৎসেনের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছে, পুনরুদ্ধার করেছে হারানো রাজ্য, মধুর বাক্যে যমকে তুষ্ট করে স্বামী সত্যবানের পুনঃপ্রাণদানের অসাধ্য সাধন করেছে, ধনে-জনে-পুত্রে ঐশ্বর্যময় করেছে আপন সংসার। আপন ইচ্ছা প্রকাশের আর তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্র ছিল তার সামনে। কিন্তু উপনিবেশিত দেশে সাবিত্রী মিথ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। সাবিত্রীর সতীত্ব হায়েনাদের আক্রমণে শতচ্ছিন্ন। তার নিজের দেহটি নিজের নয়, যখন-তখন যে-কেউ দখলে নিতে পারে তার দেহ, পশুর মতো ভোগও করতে পারে বিনা বাধায়, আবার ভোগের প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে যায় তখন তাকে কোনো অন্ধকার গলিতে অনায়াসে ফেলেও দিতে পারে; কারণ নৈতিকতার কোনো দায় উপনিবেশকের নেই। উপনিবেশিত সাবিত্রীর আপন ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই, উপনিবেশকের ইচ্ছাই নিয়তির মতো মূল্যবান। এই সাবিত্রীর কোনো সমাজ নেই, সংসার নেই, স্বামী নেই, পুত্র-স্বজন কিছুই নেই, এমনকি তার নিজের মধ্যে নিজেই নেই। এই সাবিত্রী মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত, উপনিবেশ তাকে মাতৃত্ব-বঞ্চিত করেছে। এই সাবিত্রী সর্বরিক্ত, এই সাবিত্রী উপনিবেশের, এই সাবিত্রী প্রকারান্তরে উপনিবেশকের প্রবল শোষণে নিষ্পেষিত বাংলা। সাবিত্রী নিজেকে রক্ষা করতে পারে না; উপনিবেশের পুরুষও অক্ষম, নিজের স্ত্রীকে অন্যের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে

অসমর্থ। তার অর্থনৈতিক অবস্থা চরম দৈন্যে নিপতিত; সে নিঃস্ব, রিক্ত; তার যেন কিছুই করার নেই, দায় এড়ানো ছাড়া। পুরাণে দৈবীশক্তি নিয়ন্ত্রণ করেছে মানুষের ভাগ্য, উপনিবেশিত বাংলায় দৈবের জায়গা নিয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তি। তবে গুণগত পার্থক্যও আছে দুই শক্তির মধ্যে – স্তবে, আনুগত্যে বৈরী দৈবও বশীভূত হতো, এক বরাভয় প্রসন্নতায় ধনে-জনে-মানে পূর্ণ করে দিত জীবন। আর ঔপনিবেশিক শক্তির আনুকূল্য কোন আনুগত্যেই উপনিবেশিতরা পায়নি, উপনিবেশকের লাভালাভের হিসাবের সঙ্গে জড়িত ছিল আনুকূল্য বা প্রতিকূলতার বিষয়টি। পুরাণের সাবিত্রীকে নিরাশ করেনি ভয়ানক যম, প্রশংসায় বশীভূত হয়েছে; আর উপনিবেশের মানসপুত্র দুর্গাপদরা সাবিত্রীকে ভোগের তপ্ত কড়াইয়ে ফেলে রিক্ত, নিঃস্ব, নীরক্ত করে ছেড়েছে; কোনো আর্তনাদই তাদের বধির কানে পৌঁছেনি। উপনিবেশকের পরিচর্যায় বাঙালির চিরায়ত কল্যাণচিন্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিধ্বস্ত হয়েছে; নৈতিক মূল্যবোধে নেমে এসেছে ধস; প্রতারণা, লুণ্ঠন, দুর্নীতি, ধর্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পৌঁচেছে।

৪.৮

হাসান আজিজুল হক নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের সঙ্গে উপনিবেশিত দেশের প্রতি ঔপনিবেশিক শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের মধ্যে সমরূপতা আরোপ করে *সাবিত্রী উপাখ্যান*-এ বিপন্ন নারীর রূপরেখায় আঁকতে চেয়েছেন উপনিবেশপীড়িত বিপন্ন দেশের ছবি। উপন্যাসে পরিদৃষ্ট হয়, নারী ও স্বদেশ একই মাত্রায় পুরুষ ও শাসক দ্বারা আক্রান্ত। উপন্যাসে সাবিত্রীর শরীর যেমন তার নিজের নয়, তার অনিন্দ্যসুন্দর দেহের প্রতি দুর্দমনীয় লোভে কতিপয় পুরুষ যেমন তাকে জোরপূর্বক দখলে নিয়ে ইচ্ছেমতো ভোগ করেছে, ধর্ষণে ধর্ষণে বিপন্ন করেছে, একইভাবে বাংলার বিপুল সম্পদের লোভে জোরপূর্বক দখল করে উপনিবেশক ব্রিটিশরা এ দেশটিকে লুণ্ঠনে লুণ্ঠনে জেরবার করে ছেড়েছে। নিজের দেশ ও দেশের সম্পদের ওপর এদেশের মানুষের কোনো অধিকার ছিল না। এ দেশের মানুষকে পদদলিত করে মানুষের শ্রম ও ফসলকে নিজেদের করায়ত্ব করেছে। উপনিবেশিত সময়টা ছিল আসুরিক। সাবিত্রীকে খুবলে খেয়েছে নরপশুরা, বলাৎকারে বলাৎকারে নিষ্পেষিত করেছে; ইংরেজ উপনিবেশকেরাও একইভাবে লুঠ করেছে এ দেশের সম্পদ। উপনিবেশিত বাংলা নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে জুগিয়েছে ইংরেজদের ভোগের উপচার; সাবিত্রী যেমন ধর্ষণে ধর্ষণে 'ধরিত্রী' হয়ে যায়। এ ধর্ষণের বিচার হয় না উপনিবেশক ন্যায়ের স্বাভাবিক নিয়মে, লুঠপাটের বিচারও নেই। সাপ ও বেজির লড়াইয়ের রূপকে উপনিবেশক আর উপনিবেশিতের চিরায়ত সম্পর্ককে অভিব্যঞ্জিত এভাবে :

> "পূব-উত্তর কোণের সবচেয়ে বড়ো কাঁটা জঙ্গলের তলা থেকে বেরিয়ে এল একটা বেজি।... এটা সোনালি, ছাইরঙের শীতে লোমগুলো কাঁটা হয়ে ছিল, এখন একটু রোদ পুইয়ে নিচ্ছে। একটা চোখের ওপর পড়েছে আলো, ঝিকমিক করছে সেটা।... দক্ষিণদিকের দেয়ালের পাশে স্তূপাকার সাদা ফাঁপা মাটির মধ্যে থেকে গম-রঙের বিরাট

সাপ বেরিয়ে এল।...আলো ঝলকাচ্ছে তার দেহ থেকে।...আঁকাকাবাঁকা ঝর্ণাস্রোতের চলন তার। এত শীতে তো কখনো বেরোয় না তারা! জমে গিয়েছে, একটু রোদ চাই তার। ঠিক তখন চার চোখের মিলন–একই মৃত্যু দুই দিক থেকে।... বেজিটা শক্ত হয়ে গেল, সরু ছুঁচলো মুখটা স্থির। একদম ছোট মুখ তো –– হাঁ করলে কতো বড় হতে পারে? সাপটাও তাকে দেখল হঠাৎ। একটু ইতস্তত করছে বটে কিন্তু সে অতি সামান্য, তখুনি ফণা মেলে অর্ধেক শরীর তুলে দাঁড়াল সে।...বিশাল ফণাটা দোলাচ্ছে, নিখুঁত মাপমতো ডানে বাঁয়ে।... সে দেখতে পাচ্ছে ওর একদিকের চোখ। তাতে খুব ঠাণ্ডা হিংসা, এই রোদের তাপেও তা স্থির জমাট। কে বেশি সময় নিল? দারুণ ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে এল বেজিটা। একেবারে মুখোমুখি। একটুও দেরি করল না সাপ, তীব্র একটা ছোবল বসিয়ে দিল বেজিটার ঘাড়ে।...সাপের একবারে গায়ের ওপর বেজি, একটির পর একটি চোখ ধাঁধানো ছোবল পড়ছে তার গায়ে। ... বেজি সামনে আসছে, পাশে যাচ্ছে, ঘুরে লেজের দিকে যাচ্ছে, ব্যতিব্যস্ত রাখছে শত্রুকে, ছোবল আর বিষ ফুরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছে।...কখন ক্লান্ত হয়েছে সাপ, বিষের ভাণ্ড শেষ হয়ে আসছে তার, সমস্ত প্রাণটা একসঙ্গে জড়ো করে শেষ ছোবলটা সে ঠিকই মারল শত্রুর শক্ত খাড়া লোম-ঢাকা পিঠে। কিন্তু সেখান থেকে মাথা তোলার আগেই একটা লাফ দিয়ে, সাবিত্রী দেখল, বেজিটা তার অত ছোট মুখ দিয়েই কামড়ে ধরেছে গুটিয়ে-আসা ফণার ঠিক নিচে আর একই সঙ্গে অন্তত পাঁচটা কুণ্ডলি দিয়ে বেজিটাকে পেঁচিয়ে ধরেছে গমরঙা বিষধর। ঐটুকু শরীরের এই বেজিটাকে অতগুলি কুণ্ডলি দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে, পিষে তো ওকে ফেলবেই। সাবিত্রী একেবারে সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল, বেজির মরণ-চ্যাচানি শুনতে পাবে ভাবল, তবে তখুনি সে দেখতে পেল সাপের মাথা খণ্ড হয়ে মাটিতে পড়ল আর প্রায় দেখাই গেল না যা তা হলো, কুণ্ডলিগুলো খুলে গেল আর সর্পরাজের দেহ পাঁচটা কি ছ-টা খণ্ড হয়ে মাটিতে পড়ল।... সাবিত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পলক পড়ছে না চোখে। ... সাপিনী যা পারে নি, তা সে পারবেই। ... চাউনি তার স্থির আর হিম।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ১২২)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে 'বেজি' উপনিবেশক আর 'গম-রঙের বিরাট সাপ' উপনিবেশিতের প্রতীক। বেজির 'চোখে' আর সাপের 'দেহে' আলো ঝলকায়। একই 'আলো' দুই দেহে ভিন্নার্থে দ্যোতিত। বেজির চোখের আলো উপনিবেশকের দুর্মর লোভের আর সাপের দেহের আলো বিরাট ভারতীয় উপনিবেশের বিপুল সম্পদের অভিব্যঞ্জক। সাপ যতই বিশাল দেহী আর বিষাক্ত হোক, সে প্রকৃতিগতভাবে নিরীহ; শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত না হলে সে কাউকে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে না। শীতল রক্তের প্রাণী হিসেবে শীতকাল সাপের জন্য বৈরী সময়। বেজির সঙ্গে চার চোখের মিলনে দ্বন্দ্ব পরিহারই সাপের ইচ্ছা। কিন্তু ছোট্ট অথচ আগ্রাসী বেজি তা হতে দেবে কেন? ঔপনিবেশিক শক্তির ধর্মই তা-ই; দৌড়ে গিয়ে একেবারে সাপের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ে। ধূর্ত বেজি সাপকে কৌশলে পরাভূত করার অপেক্ষায় থাকে। সাপ যখন প্রবল আক্রোশে একের পর এক ছোবলে নিজের শক্তি ক্ষয় করছিল, তখন ধূর্ততার সঙ্গে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সাপের আক্রমণগুলোকে ব্যর্থ করে দিচ্ছিল মাত্র। সর্বশেষ ছোবলের সময়ে বেজি সাপের ফণার নিচে কামড়ে দেয়। তাতেই বিশালদেহী সাপ টুকরো হয়ে মাটিতে

পড়ে থাকে। বেজির কামড়ে সাপের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া আসলে ইংরেজদের ঢেলে দেওয়া ঔপনিবেশিক বিষে আমাদের বৃহৎ দেশটি টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার রূপক। সাবিত্রী সাপিনীর সমগোত্রীয় বলেই সাপিনীর পরাভবকে স্বীকার করে নেয়নি। সাবিত্রীর চেতনায় গজিয়ে উঠে কঠিন প্রত্যয় : "সাপিনী যা পারে নি, তা সে পারবেই।"

সতীত্বের সাত পাকে বাঁধা ভারতীয় নারীর বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি সমাজে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। চারিত্রিক শুচিতার বিষয়ে আত্যন্তিক স্পর্শপ্রবণতার কারণে সন্দেহমাত্রই সমাজ নড়েচড়ে বসে, সন্দেহের তীর অনেক সময় অবান্তরভাবে গিয়ে ঠেকে আক্রান্ত নারীর ওপর। এমনটি ঘটেছিল সুদূর পৌরাণিক ত্রেতাযুগের সীতার ক্ষেত্রে, বিশ শতকের অবক্ষয়িত যুগেও এর তেমন হেরফের হয়নি। সমাজ-মানসে সাবিত্রীর অপহৃত হওয়ার ঘটনাটি যেভাবে প্রতিফলিত হতে পারে, তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে লোকজ কবির গানে। উপন্যাসে উদ্ধৃত হয়েছে, সাবিত্রীকে নিয়ে " দু-চারটে গান বাঁধা হয়েছে এর মধ্যে, বেঁধেছে গাঁয়ের কবি, গেয়ে বেড়াচ্ছে গরুর রাখাল, মাঠের মুনিষ : 'সাবিত্রীর এই যাওয়াতে ছেড়েছে পতি। কিসের কারণে মেয়েমানুষ এমন কুকর্মে মতি।' " (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ২২১)

উড়িষ্যার বেঁটে চৌকো গরিব রিকসাওয়ালার সঙ্গে সংলাপের মধ্য দিয়ে সাবিত্রীর জীবনের ধর্ষণ-ক্লান্ত দুর্বিষহ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। সবুর সাবিত্রীকে রিকসায় উঠিয়ে দিয়ে পেছন থেকে কেটে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ এলোমেলো রিকসা চালিয়ে এক পর্যায়ে রিকসাওয়ালা একটি বাড়ির সামনে থামে। সাবিত্রী ভাড়া দিতে অপারগতার কথা জানালে রিকসাওয়ালার অভিব্যক্তি হলো : "লোকটা নিজের মাথায় হাত দিল, কি বলিছঅ মাইজি? আমি মানুষ আছি। তুমি সীতা মায়ী।" (হাসান আজিজুল হক, ২০১৩ : ২০৫) সাবিত্রী সম্পর্কে রিকসাওয়ালার মন্তব্য তার নিজস্ব বিশ্বাসজাত হলেও তা সাবিত্রীর চূড়ান্ত পরিণতির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যঞ্জনা বহন করে। পুরুষ দ্বারা নৃশংসভাবে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে পুরুষকে পশুর প্রতিমায় দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি সাবিত্রীর চেতনায় তৈরি হয়েছিল, রিকসাওয়ালার মধ্যে নারীর প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ সাবিত্রী প্রত্যক্ষ করেছে তা নিশ্চয়ই তার মনে নরপশুদের পাশবিকতার বিপরীতে পুরুষ সম্পর্কে একটি সদর্থক বোধ তৈরি করেছে। অর্থাৎ পুরুষ সম্পর্কে তার বিশ্বাসের জায়গাটা সম্পূর্ণ শূন্য পড়ে থাকেনি।

পুরুষের কামনার লাভায় সাবিত্রী বিন্দুমাত্র দ্রবীভূত হয়নি; পাষাণের তেজে সে প্রত্যাখ্যান করেছে নরপশুদের প্রতিটি তাণ্ডবকে; কোনো দানব আঁচড় কাটতে পারেনি তার শুচি-শুভ্র মনে; পরম স্থৈর্যে, ধৈর্যে পশুতে খাওয়া দেহের তলায় অবিনশ্বর রেখেছে সতীত্বের মহিমাকে। সীতাকে বাস্তব পৃথিবীর সাবিত্রীর মতো ধর্ষণের ক্লেদ শরীরে বহন করতে হয়নি, তার দিকে সন্দেহের একটি তীর ছিল মাত্র, তাতেই অভিমানী সীতা আশ্রয় নেয় পৃথিবীর গর্ভে; হাঁটে আত্মবিসর্জনতার পথে। আর সাবিত্রী তার শরীরে

আঁকা সকল আঁচড় ও শরীরে মাখা সমস্ত ক্লেদকে তীব্র জেদে অবজ্ঞা করে নিজেকে প্রাণময় রেখেছে পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় :

> "সাবিত্রীকে এখন আলতো করে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেললে সে হয়ে যাবে টুকরো টুকরো ছোট-বড়ো অস্থির একটি স্তূপ। শুধু আলগা চামড়া-ঢাকা। এই ভাঙাচোরা চূর্ণ-বিচূর্ণ সাবিত্রী তার দেহটিকে বিনাশ থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও আটকাতে পারেনি। কিন্তু তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে একজন অনশ্বর সাবিত্রী। তার দেহ নেই তবু সে অলৌকিক নয় অতিপ্রাকৃতিক নয়। ঠিক জীবন যেমন সে-ও তেমনি। রোদ মেখেছে, বাতাসে ভেসেছে, জলে ভিজেছে, ফুলের ঘ্রাণ নিয়েছে, কখনো বা একটি-দুটি মল্লিকার সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে আলাপও করেছে।" (হাসান আজিজুল হক ২০১৩:পৃ. ২২২)

এভাবেই পুরাণের সীতা বিনির্মিত হয় আখ্যানের সাবিত্রীতে।

সাবিত্রীর পাষাণ-ভার বইতে বইতে পশুর দুর্দমনীয় লোভ এক সময় ক্লান্ত হয়; সাবিত্রীর কমনীয় দেহটিকে কাঁধ থেকে নামাতে বাধ্য হয় জৈবকামনারাক্ষসেরা; তার সর্বংসহা অসীম ধৈর্যের কাছে পরাভূত হয় প্রমত্ত পশুশক্তি। সনাতন ভারতের বিশাল অবয়বের তলায় লুকিয়ে আছে এমন এক প্রাণশক্তি, মানবিক চেতনায় আর সৃষ্টির যজ্ঞে যার ক্ষমতা অনিঃশেষ। ব্রিটিশ উপনিবেশক-শক্তি অবিরাম শোষণে নিঃস্ব হয়ে-যাওয়া ভারতের ভার আর নিজের কাঁধে বহন করতে চায়নি। সাবিত্রীর মতোই স্বাধীনতার নামে ভারতকে মুক্ত করে দিয়ে এদেশ থেকে তারা নিজেদের গুটিয়ে নেয়। এইটুকু মাত্র মুক্তি পেয়ে দানবের ভয়াল থাবায় বিধ্বস্ত, শরীরে শোষণ-পেষণের ভয়ানক ক্ষতচিহ্ন বহন করে অফুরান প্রাণশক্তিতে ভারতবর্ষ আবার মাথা তুলে দাঁড়ায় – উপন্যাসের পরিণামে ঔপন্যাসিকের এই সারসত্যে উপনীত হওয়ার একটি প্রচেষ্টা পাঠকের বিনির্মিত অনুভবে অনুভূত হয়।

৫.

হাসান আজিজুল হক দেশ-কাল-রাজনীতি সতর্ক শিল্পী। ব্রিটিশ উপনিবেশায়ন বাংলা তথা ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ভয়ানক ক্ষত সৃষ্টি করেছে আর ভারতের বি-উপনিবেশায়নেও উপনিবেশায়ন কতটা কুপ্রভাব রেখে গেছে তারই একটি শিল্প-সমীক্ষা যেন আলোচ্যমান এই উপন্যাস। উপদ্রুত নারীর জীবনবীক্ষায় তিনি সন্ধান করেছেন উপনিবেশিত ও উপনিবেশ-মুক্ত স্বদেশের স্বরূপ। আমাদের দেশের রক্তসিক্ত বিভক্তির উপনিবেশপোষিত রাজনৈতিক বি-উপনিবেশায়ন সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত বি-উপনিবেশায়নের অভীপ্সায় ঔপন্যাসিক করেছেন পথ-সন্ধান। রোগ সারানোর জন্য যেমন প্রথমেই রোগ-শনাক্তির বিষয়টি সবচেয়ে বেশি জরুরি, তেমনি লক্ষ্যে পৌঁছাতে তিনি আতসী পর্যবেক্ষণে ব্যবচ্ছেদ করেছেন বাংলায় উপনিবেশায়নের ধূর্ত কৌশলগুলোকে। ভারতীয় নারীর সহজাত বিপন্নতার অন্তরালে ক্রিয়াশীল চিরায়ত কল্যাণবোধ আর অশুভশক্তিকে প্রবল তেজে প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতার

মধ্যেই ঔপন্যাসিক পেয়ে গেছেন সফল বি-উপনিবেশায়নের সূত্র আর বি-উপনিবেশিত দেশের সোনালি ভবিষ্যতের রূপরেখা। বিপন্ন নারী বি-উপনিবেশিত বিশ্বের কল্যাণী রাষ্ট্রের অভিব্যঞ্জনায় বিনির্মিত হয় ঔপন্যাসিকের বোধিদীপ্ত সজ্ঞায়। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে বিনির্মাণের শিল্পী হিসেবে হাসান আজিজুল হকের বিশেষত্ব এখানেই।

টীকা

১. *জ্যাক দেরিদা* (১৯৩০- ২০০৪) ১৯৬৬ সালে হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে উপস্থাপন করেন তাঁর বিখ্যাত বিনির্মাণ তত্ত্ব, যা বিশ শতকের ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছে। আর দেরিদীয় দর্শন গড়ে উঠেছে সস্যুরের কাঠামোবাদী ভাষাদর্শনকে বিনির্মাণ করে।

সস্যুর ভাষা-ব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের নিজস্ব অবচেতনে (জেনেটিক কোয়ান্টাম নক্শায়) জৈব সংগঠনের অংশ হিসেবে ভাষাসম্পর্কীয় একটি সহজাত নিয়ম ও যুক্তি অবস্থান করে; সস্যুর একে বলেছেন Langue বা ভাষাকাঠামো। অবচেতনে রক্ষিত ভাষার যুক্তি যখন ভাষাচিহ্ন হিসেবে উচ্চারিত হয় বা লিখিতরূপে ব্যবহৃত হয় তখনকার অবস্থাকে সস্যুর বলেছেন Parole বা বাক্ । ভাষার জৈবিক সংগঠন ল্যাগ আর প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়া প্যারোল যৌথভাবে মানুষের ভাষাকে সত্তার উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করে মানুষকে করে তোলে অস্তিত্বশীল। সস্যুরের মতে, একটি শব্দ বা ভাষাপ্রতীক প্রত্যক্ষভাবে কোন বস্তু বা বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করে না; অর্থ উদ্ঘাটন করে মাত্র। এক্ষেত্রে অহং- অস্তিত্বকে নির্ভর করে একটি ভাষাচিহ্ন কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের দ্যোতক হিসেবে উপস্থিত হয় এবং দ্যোতিত হয়ে বস্তু বা বিষয়কে অর্থবোধক করে তোলে।

ভাষাচিহ্নের বিপরীতে অবস্থানকারী দ্যোতক/দ্যোতনার অবস্থান একটা মনগড়া স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা মাত্র; দ্যোতক-দ্যোতনার মধ্যে কোন পূর্ব-নির্ধারিত বা ধ্রুব সম্পর্ক অবস্থান করে না। একটি ভাষাচিহ্নের দ্যোতক-দ্যোতনায় সবসময় একটি তুলনামূলক গ্রহণ-বর্জন নীতি সক্রিয় থাকে। বস্তুত মানবিক চেতনা-কাঠামো সবসময় ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন যুগ্ম-বৈপরীত্য-কে কেন্দ্র করে মানুষ তার অহং-কেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুভূতি ধারণার বৃত্ত রচনা করে থাকে। তদুপরি সস্যুর মনে তেন, অহং-সত্তার উপস্থিতির কারণে 'উচ্চারিত ভাষারূপ' বিশুদ্ধ আর তার 'লিখিত রূপ' সর্বতোভাবে অশুদ্ধ ও বিপজ্জনক। দেরিদা একে দেখেছেন 'ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য' হিসেবে এবং 'মৌখিক ভাষা/ লিখিত ভাষা'-এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের শ্রেণিমর্যাদায় লিখিত ভাষার ওপর মৌখিক ভাষার প্রাধান্যকে চিহ্নিত করেছেন 'উগ্র শ্রেণিমর্যাদা' বা violent hierarchy বলে। অথচ মৌখিক ও লিখিত ভাষার একক ও অভিন্ন উৎস হলো মানুষের অবচেতনে অঙ্কিত ধ্রুব ভাষাকাঠামো। তাই দেরিদা প্রচলিত 'মৌখিক ভাষা/লিখিত ভাষা' - এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের উগ্র শ্রেণিমর্যাদার বিচ্যুতি ঘটিয়ে মৌখিক ও লিখিত ভাষার সমান মর্যাদার কথা ভাবেন। অহম্-এর উপস্থিতির কারণে মানবিক চিন্তন-ক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময় 'আমি'-কেন্দ্রিক কিছু ধারণা বা centre থাকে, যাকে দেরিদা বলেছেন logocentrism। ভাষাচিহ্নের অর্থ-উদ্ধারের প্রক্রিয়ায় মানবিক চেতনার ক্রিয়াই থাকে মুখ্য, যার ফলে একজন মানুষের উপস্থিতি বা অস্তিত্বকে গ্রাহ্য করে তৈরি হয় এক অতীন্দ্রিয় অধিতাত্ত্বিক জগৎ। দেরিদার মতে, অহং-সত্তাকেন্দ্রিক চিন্তা প্রকৃত সত্য কিংবা অর্থকে উদ্ধার করে না, কারণ প্রকৃত সত্য ও অর্থ এক সময়হীন ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তিনি বলেন, মানবিক উপস্থিতি বা অস্তিত্ব ভাষামাধ্যমেই প্রকাশিত, যা কিছু আছে তা

সবই অস্তিত্বশীল কিন্তু অস্তিত্বহীনতার উপস্থিতি না থাকলে মানুষের পক্ষে অস্তিত্বকেও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। "দেরিদিয় দর্শনে, কাঠামোবাদের বহুল আলোচিত যুগ্ম-বৈপরীত্যের উগ্র বিচ্যুতি ঘটানো হলেও, কোনো একটি বিশেষ শব্দ-ধারণাকে অধিক মূল্য দেওয়া হয় না, বরং বিচ্যুত যুগ্ম-বৈপরীত্যের যে-কোনো একটি শব্দ-ধারণা'র মাঝে তার বিপরীত শব্দের ছায়া-উপস্থিতি (trace), অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বকে কেন্দ্র করে, ক্রিয়াশীল থাকে। যার ফলে মানবিক চিন্তা কোনো স্থির কেন্দ খুঁজে পায় না। বিনির্মাণ দর্শনে ভাষার উচ্চারিত ও লিখিত রূপের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত সম্পর্কই সম্পূরক এবং একই সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে বিনিময়যোগ্য। একটি ভাষাব্যবস্থার আওতাধীন বিভিন্ন ভাষাচিহ্ন দেশ-কাল-কেন্দ্রিক তুলনামূলক গ্রহণ-বর্জন, বিনিময়যোগ্যতা ও সম্পূরকতার নীতি অনুসরণ করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অর্থ প্রদান করে। উচ্চারিত মৌখিক ভাষায় অহং-এর উপস্থিতির কারণে কোন ভাষাচিহ্ন আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। আর অহং-এর গৌণ অস্তিত্বের কারণে লিখিত ভাষার ব্যাখ্যা সবসময় সময়কেন্দ্রিক এবং বিভিন্ন দেশ-কাল প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষিত হয়ে সৃষ্টি করে বহুমাত্রিক ও অসীম দ্যোতনা (endless signification)। দেরিদা এর কারণ হিসেবে সনাক্ত করেছেন যতিভেদ বা differance-কে।

কাঠামোবাদে যুগ্ম-বৈপরীত্যের শ্রেণি-মর্যাদা ছিল স্থির। কিন্তু বিনির্মাণ তত্ত্বে ভাষার উপাদান যুগ্ম-বৈপরীত্যেও ঘটে উগ্র শ্রেণি- বিচ্যুতি। যুগ্ম-বৈপরীত্যের এই উগ্র শ্রেণি-বিচ্যুতির কারণে শব্দসমূহের মধ্যে যে মুক্তক্রীড়ার সৃষ্টি হয় তারই ফলে ভাষায় কোনো স্থির কাঠামো কিংবা ভাষা-অর্থের কোনো নির্দিষ্ট উপস্থিতি থাকে না।

ভাষার মুক্তক্রীড়া বা free play-ই আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারে সৃষ্টির ব্যঞ্জনা ও নান্দনিক উপলব্ধি। সাহিত্যের বেলায় দেরিদার বিনির্মাণ কাজ করবেই, কারণ সাহিত্যের নান্দনিক প্রকাশে গূঢ়োক্তি (trope), ব্যাজস্তুতি (irony), রূপকালঙ্কার (metaphor), আংশিক উপস্থাপন (synecdoche), লক্ষণালংকার (metonomy), অতিশয়োক্তি (hyperbole), রূপান্তর (metalepsis) ইত্যাদি কাজ করে। তবে কিছু পাঠ করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে দেরিদার সেই বিখ্যাত উক্তি : 'There is nothing outside text.' একটি সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে কীভাবে বিনির্মাণ কাজ করছে এবং একটি text-র মাঝে বিনির্মাণযোগ্য কী কী উপাদান লুকিয়ে আছে তা উদ্ঘাটন করাও একজন সাহিত্য-সমালোচকের কাজ।

২. রুশ ভাষাতাত্ত্বিক *মিখাইল বাখতিন* (১৮৯৫-১৯৭৫) প্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে উপন্যাসের নান্দনিক এককের সন্ধান করেছেন। 'জীবনের বহুস্বরন্যাস'-এর ভিতে গড়ে ওঠেছে তাঁর তত্ত্বদর্শন। তাঁর তত্ত্বে জীবন ও শিল্প অভেদ মর্যাদায় অভিষিক্ত। জীবনকে তিনি বলেছেন 'উপন্যাসত্ব'। তাঁর কাছে উপন্যাস শুধু আর মাত্র একটি সাহিত্যরূপ নয়, উপন্যাসই আমাদের কালের সাহিত্যের প্রধান বিষয়। লিরিক,এপিক ও ট্র্যাজেডি – সাহিত্যের এসব প্রতিষ্ঠিত ও কাঠামো-নির্দিষ্ট ফর্মের সঙ্গে তুলনা সাপেক্ষে তিনি উপন্যাসের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপের সন্ধান করেছেন। বাখতিন বলেছেন, উপন্যাস এমনই এক শিল্পকর্ম, যা কোনো কাঠামোতে, কোনো কাঠামোতেই, আঁটে না। ফর্মের কাঠামো অস্বীকারের প্রয়োজনে, সাহিত্যের সীমা ও প্রচলিত বিধিনিষেধ অতিক্রমণের তাগিদ থেকেই উপন্যাসের সৃষ্টি। উপন্যাস স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, স্বাবলম্বী, ফর্মনিরপেক্ষ ও স্বক্ষেত্রে স্বাধীন।

লিরিক, এপিক ও ট্র্যাজেডিতে রচনাকারের উপস্থিতি উহ্য থাকে ফর্মের কারণেই; আবার ফর্মের প্রয়োজনেই উপন্যাসের ভেতরে ঔপন্যাসিককে কোনো না কোনোভাবে উপস্থিত থাকতে হয়। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সচেতনভাবে শব্দসংকর ঘটিয়ে একটি সংঘটন তৈরি করেন। শব্দের সেখানে কোন জন্মান্তর বা অর্থান্তর হয় না; বরং শব্দকে অনেক বেশি করে, প্রায়

পরিত্রাণহীন ভাবে অর্থের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। তারপর সেই অর্থান্তরহীন শব্দকে তার মূল অর্থসহই একটা ভিন্নতর উদ্দেশ্যে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

উপন্যাসে একটি বিষয়ের বহু পক্ষ তৈরি করে অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতিতে চরিত্রগুলোকে নিক্ষেপ করা হয়, সেই পরিস্থিতি তাকে আরো বেশি উন্মোচিত করে। নতুন নতুন আঘাতে বার বার তার ধ্যানের জগৎ পরিবর্তিত হয়। কখনো সে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে, কখনো তাও পারে না।

উপন্যাস সংলাপপ্রধান; আর সংলাপবৈচিত্র্য থেকে আসে পলিফনি বা বহুস্বরসঙ্গতি। উপন্যাসে এমন সব উপাদানের সমাবেশ ঘটানো হয় যাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। সেই উপাদানগুলিকে নিয়ে তৈরি হয় উপন্যাসের ভিতরে সেই উপাদানগুলির বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র জগৎ। তাদের থাকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সচেতনা। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেও উপন্যাসে তাদের মূল্য সমান। এই সচেতনাগুলি শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে একটা উচ্চতর শৃঙ্খলায় বাঁধা পড়ে। স্বাতন্ত্র্য, পরস্পর-বিচ্ছিন্নতা ও সমমূল্য থেকেই উচ্চতর শৃঙ্খলা তৈরি হয়। বাখতিন একেই বলেছেন 'পলিফনিক উপন্যাসের শৃঙ্খলা'। এই শৃঙ্খলা বা পলিফনি হয়ে উঠাটাই উপন্যাসের ফর্ম বা আধার।

৩. তুলনীয় : "তারাশঙ্কর একটা অসুস্থ সমাজের চেহারা ফুটিয়েছেন, সুস্থ জন্তু-জানোয়ারের প্রতিমা দিয়ে, এই বিরোধাভাস থেকে তাঁর শিল্পী-স্বভাবের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। টমাস মান বলেছেন, স্বাস্থ্য জিনিসটা জান্তব, প্রাকৃতিক; আর অস্বাস্থ্য হচ্ছে মানবীয়, মনোময়, প্রকৃতিবিচ্যুত অপ্রাকৃতিক (Thomas Mann, op.cit, pp. 108-110) স্বাভাবিকতা, মাটির সঙ্গে নাড়ীর যোগ, তারাশঙ্করের চারিত্র-লক্ষণ, মৌলিক শক্তি। প্রথম যুগের অচিন্ত্যকুমার হচ্ছেন তাঁর বিপরীতধর্মের লেখক: নাগরিক, শিলার-এর অর্থে 'সেন্টিমেন্টাল', অপ্রাকৃতিক। ...অচিন্ত্যকুমারের প্রতি তারাশঙ্করের এই আকর্ষণকে নাগরিকের প্রতি গ্রামীণের — শিলারের পরিভাষায় 'সেন্টিমেন্টাল'-এর প্রতি 'নাইভ'-এর — স্বাভাবিক টান বলা যেতে পারে।" (প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ২০১৪ : পৃ. ৪৬-৪৭)

গ্রন্থপঞ্জি

অভিতাভ দাস। (২০১০)। *আখ্যানতত্ত্ব*, কলকাতা : ইন্দাস।

অশ্রুকুমার শিকদার। (১৯৯৩)। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী।

আনিসুজ্জামান (প্রধান সম্পাদক)। (২০০৮) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

চন্দন আনোয়ার (সম্পাদিত)। (২০১২)। *গল্পকথা হাসান আজিজুল হক সংখ্যা*, রাজশাহী।

চন্দন আনোয়ার (সম্পাদিত)। (২০১৫)। *হাসান আজিজুল হক : নিবিড় অবলোকন*, ঢাকা : কথাপ্রকাশ।

তপোধীর ভট্টাচার্য। (২০০৯)। *বাখতিন*, কলকাতা : এবং মোশায়েরা।

দেবেশ রায়। (১৯৯৪)। *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

(১৯৯৪)। *উপন্যাস নিয়ে*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য। (২০১৪)। *আখ্যান ও সমাজ : তারাশঙ্কর*, কলকাতা : অবভাস।

বেগম আকতার কামাল। (২০১২)। *মহাবিদ্রোহের আখ্যানতত্ত্ব ও কথাশিল্প*, ঢাকা : ধ্রুবপদ।

(সম্পা.) (২০১৪)। *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, ঢাকা : অবসর।

ভীষ্মদেব চৌধুরী। (১৩৯৫)। *জগদীশ গুপ্তের গল্প : পঙ্ক ও পঙ্কজ*, ঢাকা : ফুলদল প্রকাশনী।

(২০১০)। *নিয়তির পক্ষ-বিপক্ষ ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

(২০১৩)। *জনান্তিকের মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা : কথাপ্রকাশ।

মঈন চৌধুরী। (২০১২)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ঢাকা : নদী প্রকাশন।

মোহাম্মদ আজম। (২০১৪)। *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা : আদর্শ।

রফিকউল্লাহ খান। (২০১১) *আখ্যানতত্ত্ব ও চরিত্রায়ণ*, ঢাকা : চারুলিপি।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৭৬)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা : সাহিত্যশ্রী।

সিরাজ সালেকীন। (২০১৩)। *ভারতীয় শাস্ত্রে নারীকথা*, ঢাকা : কথাপ্রকাশ।

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। (২০০৮)। *উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

হাসান আজিজুল হক। (২০১০)। *তিনটি উপন্যাসিকা*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

(২০১১)। *আগুনপাখি*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

(২০১৩)। *সাবিত্রী উপাখ্যান*, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।